অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রবর্তিত
অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধবিধি

আমার আশীর্বাদ দুর্ভেদ্য
কবচের ন্যায় অনন্তকাল
তোমাদিগকে রক্ষা করিবে ।

- শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রবর্তিত
অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ বিধি

জ্ঞাতব্য

অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্বন্ধে অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের কতিপয় নির্দেশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

১। **ভবিষ্যদ্‌বাণী** :- "আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলাম যে, একদা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি একমাত্র সমবেত উপাসনার দ্বারাই অখণ্ডমতে হইবে । আমি কোনও আদেশ কাহাকেও দেই নাই, কোনও বিধিও প্রবর্তন করি নাই । বিধাতা নিজে-নিজে বিধান প্রবর্তন করিতেছেন, আমি অনুমোদন করিবার কর্তা মাত্র । আচার, অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রবর্তক রূপে আমি চিহ্নিত হইতে চাহি না । আদর্শের প্রবক্তা হইতে পারিলেই যথেষ্ট । তোমরা কাল-প্রতীক্ষা কর, আপনা আপনি অনুষ্ঠানগুলি প্রবর্তিত এবং বিবর্তিত হইবে ।" (প্রঃ বৈঃ১৩৭২ পৃঃ ৫০)

২। "সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠানান্তে যে-কোনও শুভকার্য প্রশস্ত, মাস, তারিখ, তিথি, বার, গ্রহ-নক্ষত্র কিছুরই প্রয়োজন নাই । তথাপি কুলাচার মতে যাহারা যে অনুষ্ঠান করিতে চাহে, তাহার সহিত আমাদের বিরোধ করিবার কিছুই নাই । একদা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, গাত্রহরিদ্রা, দ্বিরাগমন, গর্ভাধান, সাধভক্ষণ, নাম-করণ, বিদ্যারম্ভ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন সকলই

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

একমাত্র সমবেত উপাসনার দ্বারা নির্বাহ হইবে।" (উঃ প্রঃ)

৩। "তুমি অখণ্ড মতে মাতৃশ্রাদ্ধ করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। অখণ্ড মত মানে আমার মত, যে মতে অপর মতের প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা নাই, কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি বিরোধ বা বিদ্বেষ নাই। তুমি যদি অখণ্ডমতে মাতৃশ্রাদ্ধ না করিয়া প্রচলিত কৌলিক মতে করিতে, তাহা হইলেও আমার দিক্ দিয়া আপত্তির কিছুই ছিল না। আমি কখনও বলি নাই বা বলিব না যে, আমার শিষ্য হইলে অখণ্ডমতেই পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু একদিন লক্ষ লক্ষ লোক অখণ্ডমতেই শ্রাদ্ধ-বিবাহাদি করিবে, ইহা আমার ভবিষ্যদ্বাণী। এ বাণী কাহারও উপর বাধ্যকর কোন নির্দেশ নহে। ইহা ভাবীকালের সত্য ঘোষণা। ——শ্রাদ্ধের মূল কথা পরলোক -প্রস্থিতের আত্মার শান্তি প্রার্থনা। —— হিন্দু সমাজের জনসাধারণ কৌলিক মতে যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন, তাহাতে অনেক বিচিত্রতা আছে কিন্তু মূলকথা দেহচ্যুত আত্মার সর্বতোভদ্র শান্তি প্রার্থনা। প্রার্থনাটুকুই সূক্ষ্মভাবে কাজ করে। ---- যাঁহারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পৌরাণিক বহু পূজিত এবং বহুনিন্দিত দেবগণের আমদানি সহ্য করিতে পারেন না অথচ দেশপ্রচলিত সবগুলি সংস্কারকেই মন হইতে সমূলে উৎখাত করিয়া দিতে পারেন নাই, তাঁহাদেরও শ্রাদ্ধের প্রয়োজন আছে। তাঁহারাও পিতামাতার অপরিশোধ্য ঋণ বৎসরে একবার করিয়া স্মরণ না করিয়া পারেন না। অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ তাঁহাদের পক্ষে অতীব প্রিয় অনুষ্ঠান হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, ইহাতে শ্রাদ্ধীয় শোককাতরতা থাকে না অথচ বিদেহী আত্মার মুক্তি কামনা জাজ্জ্বল্যমান। কৌলিক প্রথাগত শ্রাদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে একটি চমৎকার সংস্কার খেলা করিতেছে যে, শ্রাদ্ধীয় সমগ্র সামগ্রীর উপরে প্রেতের দৃষ্টি পড়ে এবং যাবতীয়

ভোজ্য-পানীয় প্রেতের উচ্ছিষ্ট হয়। এই কারণে সদাচারী বিপ্রগণ এবং শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবগণ প্রাণান্তেও কাহারো গৃহে শ্রাদ্ধীয় অন্ন গ্রহণ করেন না। যাঁহারা টিকি ঝাড়িয়া মাথা নাড়িয়া কৌলিক এই প্রথাগত শ্রাদ্ধটীর ব্যবস্থা দিতেছেন, তাঁহারা নিজেরাই শ্রাদ্ধের বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করিবেন না। কি আশ্চর্য! এমনও দেখিয়াছি, পুরোহিত শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইলেন, গামছায় বাঁধিয়া অনেক কিছু লইয়াও গেলেন কিন্তু শ্রাদ্ধের বাড়ী বলিয়া সেখানে খাইলেন না। এমন কথাও শুনিয়াছি যে, কেহ কেহ নাকি দেখিয়াছেন, শ্রাদ্ধীয় মন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া পরলোকগত আত্মা সহসা হাত বাড়ইয়া ইদং নীরং ইদং ক্ষীরং ইদং পিণ্ডং তুলিয়া তুলিয়া শূন্যে উঠাইয়া লইতেছেন। এই সকল চাক্ষুষ প্রমাণ প্রদর্শনের পরে কে শ্রাদ্ধের বাড়ীতে প্রেতের উচ্ছিষ্ট খাইবে? সদ্‌ব্রাহ্মণ, সাধু এবং বৈষ্ণবেরা ত' বর্জন করিলেন, একমাত্র কুব্রাহ্মণ, লোভী এবং ঔদরিকেরাই পাত পাড়িয়া বসিলেন। প্রথাগত সংস্কারের এই দৌরাত্ম্য হেতু শ্রাদ্ধকারীরা এত অর্থব্যয় করিয়াও শেষ পর্যন্ত নিজেদিগকে অপরাধী বলিয়া মনে করিতে থাকেন। কিন্তু অখণ্ডবিধিতে শ্রাদ্ধের পটভূমিকা পৃথক। যাঁহার শ্রাদ্ধ হইতেছে, তিনিও সকল উপাসক-উপাসিকাদের সহিত একজন সমসাধক। সকলে যখন তাঁহার আত্মার মুক্তির জন্য উপাসনা করিতেছেন, তখন তিনিও একজন সমোপাসক। উপাসনা যখন শেষ হইয়া যাইতেছে, তখন তাঁহার মুক্তি হইয়া গেল। উপাসনার ভোগ-নৈবেদ্য কাহারও লুব্ধ-দৃষ্টির বস্তু নহে; উহা কাহারও উচ্ছিষ্ট হইল না। সমাগত সজ্জনেরা দ্বিধাহীন কুণ্ঠাহীন মনে সানন্দে সাহ্লাদে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত শোকের ছায়া মনের ক্ষুদ্র কোণটি হইতে পর্যন্ত সরিয়া গেল। শ্রাদ্ধকারী তৃপ্তিতে, আনন্দে ভরপূর

হইলেন । অখণ্ডবিধিতে শ্রাদ্ধ যে নানাস্থানে আপনা আপনি চলিতেছে, আমাকে যে একটু ভবিষ্যদ্বাণী করা ছাড়া আর কিছুই করিতে হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ ইহা । কৌলিক প্রথানুযায়ী শ্রাদ্ধের লৌকিকতার চাপ, সামাজিকতার দাপট ইত্যাদি অখণ্ডমতের শ্রাদ্ধে না থাকায় শ্রাদ্ধাধিকারী পরম নিশ্চিন্তে অন্য দশ জনের স্বেচ্ছাদত্ত স্বাভাবিক সহায়তায় কাজটি সুসম্পন্ন করিতে পারেন।” (প্রঃ চৈত্র ১৩৭৫ পৃঃ ১১১৫)

শ্রাদ্ধ-বিধান

১। “যে স্থলে একমাত্র সমবেত উপাসনার দ্বারাই শ্রাদ্ধ-কার্য সম্পাদন-ইচ্ছা, সেখানে অখণ্ডগণ ব্রাহ্মণ, এই বিচারে ব্রাহ্মণোচিত দিবসে সমবেত উপাসনা করিলেই শ্রাদ্ধ হইবে । ইহার পরে অখণ্ড-সংহিতা দান ও ভগবদ্ভক্তদের তথা দরিদ্র-নারায়ণের সেবা এবং হরিওঁ কীর্তন কর্তব্য হইবে । আত্মীয়-পরিজনদের মনের দিকে তাকাইয়া যদি একুশ বা ত্রিশ দিনে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, করিবে, বাধা নাই, কিন্তু শ্রাদ্ধীয় সমবেত উপাসনাদি পারলৌকিক কর্ম হইবার পূর্ব পর্যন্ত অশৌচ পালন করিবে । মৃতদেহ-দাহান্তে স্নান সারিলেই যে কোনও স্থানে সমবেত উপাসনায় যোগ দেওয়া যায় বা অঞ্জলি দান চলে কিন্তু শ্রাদ্ধীয় কর্তব্য সমাপনের পূর্বে কোথাও উপাসনার ভোগ নৈবেদ্য স্পর্শ করিতে যাইও না । শ্রাদ্ধাধিকারী শ্রাদ্ধের পরে ইহা করিবে । ইহা সদাচার বলিয়া জানিবে । ———

মৃত-সৎকার-কালে মৃতের বক্ষে একখানা প্রণববিগ্রহ রাখিয়া সকলে মৃতকে ঘিরিয়া অথবা পূর্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া সমবেত উপাসনা করিবে এবং তৎপরে মুখাগ্নি করিলেই চলিবে ।

মুখাগ্নির পূর্বে প্রণববিগ্রহ জলে নিরঞ্জন দিবে, দগ্ধ করিবে । দাহকার্য শেষ হইলে জপসমর্পণ মন্ত্র দ্বারা শান্তিবারি বর্ষণ রিয়া অগ্নিনির্বাণ করিবে। শ্মশান-মধ্যে কোনও প্রসাদাদি তরণ স্বাস্থ্য-তত্ত্বের দিক হইতেই সমর্থনীয় নহে । সুতরাং ইরূপ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বর্জন করিবে ।” (উঃ প্রঃ)

। “শ্মশানে এবং সংক্রামক রোগীর গৃহে সমবেত উপাসনা রিতে হইলে সর্বপ্রকার ভোগনৈবেদ্য-বর্জিত ভাবে কাজটী করিতে ইবে ।” (ধৃঃ প্রেঃ ৩য় খণ্ড পত্র ৪১)

। “শ্রাদ্ধাধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ পূর্বদিবস মস্তক মুণ্ডন রিবেন । পরদিন প্রাতে অন্যান্য ভক্ত পরিজনসহ হরিওঁ নগর-কীর্তন করিয়া আসিয়া শ্রাদ্ধাধিকারীগণ বিগ্রহ প্রণাম করিয়া প্রথম রিতে মধ্যস্থলে উপবেশন করিবেন । শ্রীশ্রী গুরুদেবের আসনের ক পিছনেই তাঁহাদের আসন থাকিবে এবং তাহার পিছনের সারি ইতে অন্যান্যেরা সুশৃঙ্খলভাবে উপাসনায় বসিবেন । ———

উপরিলিখিতভাবে বসিয়া উপাসনান্তে শ্রাদ্ধাধিকারীগণ থমে অঞ্জলির পুষ্প শ্রীবিগ্রহে অর্পণ করিবেন । তৎপর অন্যান্যেরা থারীতি সুশৃঙ্খলভাবে অঞ্জলি দিবেন ।

তৎপর প্রসাদ গ্রহণান্তর দিবসব্যাপী হরিওঁ কীর্তন আরম্ভ রিয়া সন্ধ্যায় অঞ্জলি দানান্তে উৎসব-সমাপন । হরিওঁ কীর্তন বসব্যাপী করিবার অসুবিধা থাকিলে বিকালে বা সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ র্তন করিয়া অঞ্জলি দানান্তে উৎসব-সমাপন হইবে ।

দিবসব্যাপী কীর্তন চালাইবার মত উপযুক্ত সংখ্যক লোকের ভাব হইলে বাকী সময়টুকু অখণ্ড-সংহিতা পাঠ চলিতে পারে । বে উৎসব-সমাপ্তিতে কীর্তন ও অঞ্জলি থাকিবেই ।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

উপাসনা বা কীর্তনের সময় ফল-মূল,-খৈ, মোয়া, সন্দে
প্রভৃতি দ্বারাই নৈবেদ্য সাজাইতে হইবে । কোন অবস্থায়ই রন্ধ
সামগ্রী দেওয়া চলিবে না । তবে সমাগত উপাসক-উপাসিকা
ও স্বজন-ভোজনের জন্য খিচুরী বা পক্কান্ন ব্যঞ্জনাদির আলাদা ব্যব
থাকিতে পারে । কিন্তু কোন অবস্থায়ই মদ্য, মাংস, মৎসাদির ব্যব
করা চলিবে না ।

এই ভাবেই অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইবে ।" (প্রঃ কার্তি
১৩৬৫ বাং পৃঃ ৯৩০)

৪। "মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় শ্রাদ্ধের আগের দিন উদয়া
কীর্তন দিবেন । তাহাতে প্রসাদ বিতরণ হইবে কীর্তনান্তে অঞ্জ
দানের পরে । এই প্রসাদ শুষ্ক হইবে, যেমন সাধারণ হরির লু
হইয়া থাকে । তাহার পরে মৃতের গুণাবলী আলোচনা করিয়া কোন
অনুষ্ঠান করিতে হইলে করিতে পারেন, নতুবা নাও করিত
পারেন । শ্রাদ্ধ-দিবসে প্রাতে স্নানাদি সমাপন করিয়া একটী নগর
কীর্তনের দ্বারা সকলকে সমবেত উপাসনার স্থানে সমবে
করিবেন । তাহার পরে বিধি মতন সমবেত উপাসনা হইবে
উপাসনার ভোগ-নৈবেদ্যাদি যেমন হয় যথা খৈয়ের মোয়া
নারিকেলের নাড়ু থাকিবে, ফলমূল থাকিতে পারে । সমবে
উপাসনার পরে যার যার প্রসাদ লইয়া তিনি গৃহে ফিরিবেন । য
এই দিন অন্নপ্রসাদও লোককে দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইল
সমবেত উপাসনার পরে অন্নপ্রসাদ পাইবার পূর্ব পর্যন্ত হরিওঁ কীর্ত
রাখিবেন এবং যে যে জিনিষ মৃতব্যক্তি খাইতে ভালবাসিতে
সাধ্যমত সেই সেই জিনিষ দিয়াই আহারের ব্যবস্থা করিবেন । আমি
বর্জন এই দিন এই জন্যই ভাল যে, তাহা হইলে নিমন্ত্রিতদের
কি খান, তাহা নিয়া রুচির কলহ উঠিতে পারে না । সংহিতাদি

শ্রাদ্ধে মাংসের ব্যবস্থা থাকিলেও এমন একটী সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানে আমিষ বর্জনই অখণ্ডমতে শ্রেয়ঃ । অখণ্ডগণের মধ্যে জাতিভেদ নাই, সুতরাং সকল অখণ্ডই এই দিন আপনার গৃহে অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া আমরা মনে করি । কিন্তু যদি কেহ কোনও কারণ হেতু তাহা করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি বিরূপ হইবেন না বা তাঁহার কোনও দোষ নিবেন না । তাঁহাকে সমবেত উপাসনার প্রসাদ দিতে পারিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট অনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করিবেন । শ্রাদ্ধান্নে অনেক লোকের আপত্তি থাকে । তাহার কারণ এই যে, স্মার্ত-বিধি-অনুযায়ী যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাতে প্রেতের দৃষ্টি শ্রাদ্ধান্নে পড়ে । কিন্তু সমবেত উপাসনায় প্রেতের দৃষ্টি শ্রাদ্ধীয় কোনও ভোজ্যে পড়ে না, তিনিও আপনাদের সকলের ন্যায় উপাসনাতেই যুক্ত হইয়া থাকেন এবং উপাসনান্তে পরমাত্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাতে মিশিয়া একীভূত হইয়া যান । তাই সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান দ্বারা যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাতে শ্রাদ্ধান্নকে প্রেতান্ন বলিয়া মনে করা অসমীচীন । তথাপি কেহ চিরকালের মিথ্যা সংস্কার-বশে তাহাই করিলে তাঁহার সহিত কলহ করিবেন না; তিনি এই অনুষ্ঠানে যতটুকু সহযোগ প্রদান করেন, তাহাই প্রীতি সহকারে গ্রহণ করিবেন ।

অখণ্ডদীক্ষা দ্বারা আপনারা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন । তাই আপনারা ব্রাহ্মণের ন্যায় দশাহান্তে শ্রাদ্ধ করিলে ক্ষতি হইত না । তবে চিরকালের প্রথার দিকে তাকাইয়া বা আত্মীয়-স্বজনের মনের দিকে তাকাইয়া মাসান্তে করিতেছেন, তাহাতেও দোষ নাই । ভগবান না করুন, যদি এমন কোনও বিভ্রাট কাহারও ঘটে যে, মাসান্তেও পারিলেন না, তাহা হইলে তিনি বৎসরান্তে করিলে তাহাও শ্রাদ্ধ হইবে ।

শ্রাদ্ধ-দিবসে দরিদ্র-নারায়ণ সেবা প্রশস্ত ।

জননাশৌচ বা মৃতাশৌচ কোনও অবস্থাতেই অখণ্ড-বিগ্রহে পূজা দিতে বা স্পর্শ করিতে বাধা নাই যদি সেই কার্য শুচি ও স্নাত অবস্থায় করা হয় । কেহ মারা গেলে মৃতদেহ দাহ না হওয়া পর্যন্ত গৃহস্থের অশৌচ বলিয়া মনে করিতে হইবে । মৃতের সৎকার হইয়া যাইবার পরে স্নাত ও শুচি অবস্থায় অখণ্ড-বিগ্রহের সেবাপূজা সম্পর্কিত সকল কাজই নিজে করা যায় । ইহাতে বাধা নাই । ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা আদি দেবতারা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, কালী আদি দেবীরা মানুষের পূজা নিবার জন্য মানুষের সীমাবদ্ধ আইনকে মানিতে বাধ্য হইয়াছেন । কিন্তু অখণ্ড-বিগ্রহে সকল দেবতার সমভাবে পরিপূর্ণ মিলন ঘটাতে কোনও সীমাবদ্ধ আইনের দ্বারা তাঁহার সেবাপূজা ব্যাহত হয় না । শারীরিক শুচিতাই মাত্র একটী বিধি, যাহা অবশ্যই মানিতে হইবে । যাহার জননাশৌচ নাই বা মৃতা শৌচ নাই তেমন রমণীও রজস্বলা হইলে অখণ্ড-বিগ্রহ স্পর্শ করিবেন না বা সমবেত উপাসনাতে যোগদান করিবেন না ।" (প্রঃ ভাদ্র ১৩৬০ পৃঃ ৩২৯)

৫। "অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ করিলে তিন দিবস অন্তে বা ব্রাহ্মণোচিত নিয়মে দিবস মানিয়া শ্রাদ্ধকার্য করণীয় । তবে কেহ যদি পূর্বের সংস্কারহেতু বা অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্বগণের পানে তাকাইয়া আগের প্রচলিত দিবসেই শ্রাদ্ধ করেন, তবে তাহাও মান্য হইবে । যিনি পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, তিনি, তিন দিনই বল আর দশদিনই বল কিম্বা একমাসই বল, কাহারও শ্রাদ্ধের আশায় বসিয়া থাকেন না । তাঁহার কর্মফল তাঁহাকে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত স্থানে টানিয়া নিয়া যায় । সকলের কর্ম এক নহে বলিয়া সকলের কর্মফলও এক হয় না এবং মরিবার পরে, কেহ জীবিত-কালে ব্রাহ্মণ ছিলেন

বলিয়া বেশী খাতির পান না বা মেথর ছিলেন বলিয়া কম খাতির পান না । তথাপি যে পুত্রকন্যারা শ্রাদ্ধ করেন, তাহার দুইটী কারণ । প্রথম কারণ, ইহাদ্বারা পুত্রকন্যাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন রূপ মহৎ পুণ্য হয় । দ্বিতীয় কারণ, পুত্রাদি আত্মীয়দের শুভকামনা পারলৌকিক আত্মার শান্তি বিধান করে, এমন কি ইতিমধ্যে তাঁহার পশু, পক্ষী, কীট বা মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ হইয়া গিয়া থাকিলেও । শুদ্ধ ইচ্ছার শক্তি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া উপলক্ষিত ব্যক্তির নিকটে যায় । সেই কারণে, শ্রাদ্ধ যত ত্বরিত হয়, ততই ভাল । তবে সাধারণতঃ কেহই দিন দশেকের আগে দেহে মনে শান্ত হইতে পারেন না বলিয়া অন্ততঃ দশ দিন প্রতীক্ষা করা হইয়া থাকে । আর একদা শূদ্রাদির পক্ষে পরিচ্ছন্নতা ও শোকাপনোদন দীর্ঘকাল-সাধ্য ছিল বলিয়া তাহাদের শ্রাদ্ধকালের পরিধি বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল ।" (প্রঃ চৈত্র ১৩৬০ পৃঃ ৮২৮)

শ্রাদ্ধের ক্ষেত্র

"শ্রাদ্ধাদি আত্মীয়-স্বজনের সহিত পরামর্শক্রমে যাহা ভাল মনে হয়, সেই পদ্ধতিতে করিবে । এই ব্যাপারে সামাজিক সংঘর্ষ-সৃষ্টি আমি পছন্দ করি না । সম্পূর্ণ অখণ্ডমতে যে যে স্থানে কার্য হইয়াছে, প্রায় ক্ষেত্রেই সকলের আত্মীয়-স্বজনদের এবং সামাজিকদের সম্মতি ও সমর্থন ছিল । অন্যান্য বিপ্লবীদের বিপ্লবের সহিত আমার বিপ্লবের পার্থক্য এই যে, আমি যাঁহাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব চালাইতেছি, প্রধানতঃ তাঁহাদেরই সমর্থনে এই বিপ্লবোচ্ছাস স্ফীত হইতে স্ফীততর হইতেছে ।" (প্রঃ আষাঢ় ১৩৬৯ পৃঃ ২৫৭)

এক মতে শ্রাদ্ধ

১। "অশৌচ পার হইবার পরেই গৃহস্থের ঘরে অনুষ্ঠানাদি সঙ্গত। নতুবা আগন্তুকদের মনে খটকা থাকে।

যাঁহারা সামাজিক প্রচলিত মতে শ্রাদ্ধ-বিবাহাদি করিবেন, তাঁহাদের আবার অখণ্ডমতে করিবার দরকার কি ? যিনি করিবেন, এক মতেই করুন। দু'-নৌকায় পা দিয়া কি লাভ হইবে ?" (প্রঃ চৈত্র ১৩৬৮ পৃঃ ৯৯৫)

২। "কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, দুই মতেই শ্রাদ্ধ কর, আমি ইহার সার্থকতা বুঝিলাম না। দুই মতে করিলে বোঝা যায় যে, একটা মতের প্রতিত্ত অন্তরের বিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস লাইয়া শ্রাদ্ধ করিলে তাহার আধ্যাত্মিক সুফল কতটুকু হইবে ? শ্রাদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত করিতে হয়। ইহার মধ্যে অবিশ্বাসের ছোঁয়াচ লাগা ভাল নহে। চলিবে ত এক পথেই চলিবে, করিবে ত এক মতেই করিবে।" (প্রঃ ভাদ্র ১৩৭৪পৃঃ ৪৪১)

সংযম পালন

"প্রশ্ন ঃ পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধকারীর কি সংযম পালন আবশ্যক ?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই আবশ্যক। হিন্দু সদাচার এই বিষয়ে সংযম পালন সম্পর্কে যেই বিধি দিয়াছেন, তাহা অখণ্ডগণ অবশ্যই পালন করিবেন। নতুবা শ্রাদ্ধএকটা অতি ইতর অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া যাইবে।" (প্রঃ চৈত্র ১৩৬০ পৃঃ ৮২৯)

মস্তক মুণ্ডন

১। "সন্ন্যাসগ্রহণ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে শরীর শৌচ-বিধান হিসাবেই অতীতে মস্তক-মুণ্ডন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং অখণ্ডমতে করিতেছি বলিয়া আগেকার সব-কিছুরই পরিবর্তন করিয়া দিতে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই। শ্রাদ্ধাধিকারীদের সকলেরই মস্তক-মুণ্ডন আবশ্যক।—— একমাত্র স্ত্রীলোকদের পক্ষেই মুণ্ডন অনাবশ্যক।" (প্রঃ বৈশাখ ১৩৭২ পৃঃ ৫১)

২। "পিতৃশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধাধিকারী অবশ্যই মস্তক-মুণ্ডন করিবে। —— মস্তকমুণ্ডনে মনের শোকভার কমে ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। অতীতের যে যে প্রথা হিতকর, তাহা বর্জনের কোনও অর্থ নাই। যাহাদের বংশ-সংস্কারে উপনয়নের রীতি রহিয়াছে, তাহারা উপবীত গ্রহণ কালেও মুণ্ডিত-মস্তক হইবে, ইহাই প্রশংসনীয়। মুণ্ডন অতীত সংস্কার কাটাইয়া দেয়। কঠিন-ব্রত-পালনেচ্ছুর ব্রত-সংবাদ বাহিরে প্রচারে যদি ক্ষতি না হয়, তবে মুণ্ডন সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিতে সহায়তা করে। মুণ্ডন মানে পরিচ্ছন্ন হওয়া, শারীরিক দিক্ দিয়া ত বটেই, মানসিক দিক দিয়াও।" (প্রঃ জৈষ্ঠ ১৩৭৭ পৃঃ ১৪৮)

মৃতের প্রতিচিত্র

"অখণ্ড-বিগ্রহের সহিত না রাখিয়া এবং লোকের ধ্যানের নির্ধারিত স্থানে না রাখিয়া পাশে অন্য কোনও স্থানে পরলোকপ্রস্থিতের প্রতিচিত্র এই ক্ষেত্রে রাখা যায়।" (প্রঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ পৃঃ ১৪২)

মৃতের ইচ্ছা পূরণ

" পরলোকপ্রস্থিতের জীবৎকালে প্রকাশিত অন্তরের ইচ্ছা পূরণের জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেকের কর্তব্য, যদি সেই ইচ্ছা অন্যায় ইচ্ছা না হয়। ইনি অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ চাহিয়াছিলেন। তোমরা তাহাই করিয়াছ। ভালই করিয়াছ। এই বিষয় নিয়া সামাজিকেরা কোনও উৎপাত করিতে চাহিলে তোমরা তাহাদিগকে আমল দিও না। কোনও লোককে জোর করিয়া অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধ করিতে তোমরা বাধ্য করিও না কিন্তু কেহ স্বেচ্ছায় একাজে অগ্রসর হইলে প্রাণ থাকিতে তাহাকে বিফল হইতেও দিও না।" (প্রঃ ভাদ্র ১৩৭০ পৃঃ ৪৬৯)

মৃতের উদ্দেশ্যে আহারীয়

"তুমি যতই ঘটা করিয়া ভালভাবে শ্রাদ্ধকার্য কর না কেন, শ্রাদ্ধীয় অন্ন যে প্রেতের উচ্ছিষ্ট হয়, একথা শুনিবার পরে কোন্ রুচিমান্ শুচি ব্যক্তি তোমার গৃহে শ্রাদ্ধান্ন খাইতে বসিবেন ? তিনি তোমার গৃহ বর্জন করিবেন। মনঃসংস্কারের ইহা ফল। মৃত ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রাদ্ধ হওয়া উচিত, তাহা ব্যক্তিগত পর্যয়েই হউক বা সামূহিক ভাবেই হউক। —

হে পরম করুণাময় পরমেশ্বর, বিদেহী আত্মা সকল দুঃখ-শোকের অতীত হইয়া তোমাতে বিলীন হউক, - ইহাই প্রকৃত শ্রাদ্ধীয় মনোভাব।

শ্রাদ্ধোপলক্ষে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে আহারীয় সাজানো অখণ্ডমতে প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু লোকপ্রথানুসারে যাহারা কাজ

করে, তাহারা, যে দেশে যেরূপ রীতি, সে দেশে সেরূপ রীতির অনুসরণ করিলেই ভাল। শ্রাদ্ধের মত ব্যাপারে সামাজিক দ্বন্দ্ব বা মনের সংস্কারজ সংশয় সৃষ্টি ভাল নহে।

জীবিতাবস্থায় মৃত ব্যক্তি যাহা যাহা ভালবাসিতেন, তাহা সাজাইয়া গাভীকে, শিবাকে বা বিহঙ্গমদিগকে উৎসর্গ করিবার রীতি কোথাও কোথাও আছে। যাহার যে রীতি অনুসরণ করিবার, করুক, অখণ্ডদের ইহা নিয়া কাহারও সহিত কলহ নাই। অখণ্ডমতে ইহা আবশ্যক নহে। মৃতের প্রিয়খ্যাদ্যগুলি নিরন্ন নিরাশ্রয়কে দান করিলে অবশ্য তাহা প্রশস্যতর হইবে।

মৃতব্যক্তি জীবৎকালে হয়ত নিতান্ত অখাদ্য বা অমেধ্য বস্তু খাইতে পছন্দ করিতেন। শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাহা উৎসর্গ করিতে বোধ হয় নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা কুণ্ঠিত হইবেন। একজন হিন্দুস্থানী বা মাদ্রাজী ব্রাহ্মণের পক্ষে মৎস্য অখাদ্য, অথচ বাঙ্গালীর ব্রাহ্মণ-ভোজনে মৎস্য ছাড়া তুষ্টি নাই। কোনও কোনও অঞ্চলে হিন্দুর শ্রাদ্ধে কচ্ছপ-মাংস অপরিহার্য, আবার পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ ভদ্রলোকেরাও কচ্ছপ-মাংস স্পর্শ করিবেন না। নানা দেশে নানা প্রকারের প্রথা আছে। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, এক কথায় তাহার জবাব দিব কি করিয়া।

একজন মদ্যপায়ীর মৃত্যু হইলে শ্রাদ্ধীয় ভোজ্যপানীয়ের মধ্যে মদিরা রাখা সঙ্গত হইবে কি ?

শ্রাদ্ধ একটা সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান, যাহার সদ্যঃ সুফল শোক-ভার-বিলুপ্তি। একার্যে সাত্ত্বিকতা সর্বাংশে রক্ষিত হওয়াই উত্তম।" (ধৃঃ প্রেঃ ২৭শ খণ্ড পত্র ৪৫)

গয়াশ্রাদ্ধ (ঘৃতাহুতি)

১। "কেহ যদি নিজ নিজ পূর্বপুরুষগণের গয়াশ্রাদ্ধ করিতে চাহেন, আমি আপত্তির কারণ দেখিনা। কিন্তু কেহ যদি গয়াশ্রাদ্ধ না করেন, তাহা হইলে তেমন অখণ্ডের কোন প্রত্যবায় হয় না। একজন অখণ্ড-দীক্ষা লইয়া অখণ্ড হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, সে তাহার সমস্ত তপস্যা নিখিল বিশ্বের কুশলের জন্য করিতেছে। সুতরং যাঁহারা বলেন যে, দীক্ষা লওয়া নিজের পরকালের জন্য, ইহাতে পূর্বপুরুষদের মুক্তি কি করিয়া হইবে, - তাঁহাদের যুক্তি অখণ্ডদের সম্পর্কে খাটে না। অন্যান্য বিভিন্ন মতে যত দীক্ষা আছে, সবই নিজের মুক্তির জন্য, অখণ্ডদের সাধনা নিখিল বিশ্বের মুক্তির জন্য। সুতরাং সে গয়াশ্রাদ্ধ করুক বা না করুক, তাহার পিতৃপুরুষের মুক্তি হইবেই।

একজনের পিতার বা মাতার মৃত্যু হইলে এক ভ্রাতা যদি অখণ্ডমতে এবং অপর ভ্রাতা যদি কুলপ্রথা-মতে শ্রাদ্ধ করে, তবে করুক। উভয়বিধ শ্রাদ্ধই মৃতের আত্মার কুশলদায়ক। ইহা নিয়া দ্বন্দ্ব-কলহের কোনও অবসর নাই। একজন কুলপ্রথানুযায়ী ঘৃতাহুতি করিয়াছে, বেশ করিয়াছে। অখণ্ড-মতে ঘৃতাহুতির অবকাশ নাই বলিয়া কাহারও তদুদ্দেশ্যে আনীত ঘৃত যদি গৃহে রক্ষিত থাকে, তবে তাহা কোনও সদ্ব্যক্তিতে দান করাই শ্রেয়ঃ। মৃতের কল্যাণোদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ যেমন হিতকর, মৃতের কল্যাণোদ্দেশ্যে দানও তেমন হিতকর। অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধাদি কোনও কার্যেই ঘৃতাহুতি প্রয়োজন নহে। কেননা, ঘৃতাহুতিপ্রযুক্ত যজ্ঞ অপেক্ষা নামজপ যজ্ঞ শ্রেয়ঃ।" (প্রঃ ফাল্গুন ১৩৭৩ পৃঃ ১১৮৫)

২। "তুমি লিখিয়াছ, তোমার স্বর্গীয় পিতামাতা প্রভৃতি পিতৃপুরুষগণের গয়াধামে শ্রাদ্ধাদি করা সত্ত্বেও এতদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থানুযায়ী অদ্যাবধি পিতা-মাতার পিণ্ডাদি সহ প্রতি বৎসর শ্রাদ্ধ এবং পিতৃপক্ষে তর্পণাদি করতঃ মহালয়া পার্বণ শ্রাদ্ধ করিতেছ। কিন্তু তুমি আমার নিকটে অখণ্ড-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ, এখন তোমার কর্তব্য কি ?

বৎসর বৎসর পিণ্ডাদি প্রদান করিয়া শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজন আছে কিনা, তাহা নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিবে। যাহারা উহাতে বিশ্বাস করে, তাহাদের উহা করাই উচিত। যাহাদের উহাতে বিশ্বাস নাই, তাহারা সমবেত উপাসনার দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ বৎসর বৎসর পালন করিবেন। আমি কাহারও বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে আসি নাই কিন্তু যাহারা প্রথাগত শ্রাদ্ধ-পিণ্ডাদি পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নহে, তাহাদিগকে একটা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন দিতে চাহি। সেই অবলম্বন হইতেছে সমবেত উপাসনা।

প্রচলিত বিশ্বাস এই হইতেছে যে, গয়াধামে শ্রাদ্ধ হইলে মৃতব্যক্তির প্রেতত্ব ঘুচিয়া যায় এবং তিনি স্বর্গধামে গমন করেন বা মোক্ষপ্রাপ্ত হন। কিন্তু গয়াধামে শ্রাদ্ধ হইবার আগে যে শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতেকি তাহা হইলে তাঁহার প্রেতত্ব ঘোচে নাই, মুক্তি হয় নাই ? এই প্রশ্নটীও স্বাভাবিক ভাবেই সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়া উঠিবে। যদি মৃতান্তিক শ্রাদ্ধে আত্মার মুক্তি না হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পরে ঘটা করিয়া সেই শ্রাদ্ধটী করিবার আবশ্যকতা কি ? সেই অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ গয়ায় গিয়াই কেন করা হয় না ?

গয়া পৃথিবীর অন্য অসংখ্য স্থানের ন্যায় একটা স্থান মাত্র।

স্থানে মুক্তি নাই, মুক্তি মনে। এই স্থানে গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ হইয়াছিল বলিয়া সকলকে এখানেই আসিয়া একবারের জন্য হইলেও পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেই হইবে, শ্রদ্ধাসঞ্জাত এই বিধি একদা কহারও মনে জাগিয়াছিল। পুরোহিত সম্প্রদায় তাহাকেই নিজেদের বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণে প্রয়োগ করিয়া সর্বজনের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন যে, এখানে আসিয়া একটী বার পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ না করিলে পিতামাতার আর মুক্তি নাই। যাহা ছিল hero-worship বা বীরপূজা, তাহাই শেষে ভীতির শাসনে পরিণত হইল। কিন্তু আসল কথা হইল মনটীকে লইয়া। পিতৃমাতৃগণের প্রতি প্রেমিক মন লইয়া যেখানে বসিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, সেখানেই তাঁহারা ইহার শুভফল পাইবেন। এই জন্য গয়াকে পেটেন্ট করিয়া রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আধুনিক মন গয়ায় গিয়া পিতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয় না, পাণ্ডার উৎপীড়নের সম্ভাবনার দিকে তাকাইয়া দিবা রাত্রিতে বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়াই মাত্র থাকে। যাহা চলিতেছে, তাহা ধর্ম নহে, তাহা বিভীষিকার রাজত্ব, অশরীরী ভয় দিয়া শরীরী যজমানকে কাবু করিয়া তাহার রুধির-শোষণের চেষ্টা।

গয়াতেই সব চুকিয়া গেলে, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহাদি উপলক্ষ্য করিয়া যে পুরোহিত সম্প্রদায় সমাজ-মধ্যে সসম্মানে বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের দিন চলার ব্যাঘাত হইতে পারে। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেও গয়াশ্রাদ্ধের পরে পুনরায় বৎসর বৎসর পিণ্ডদানের প্রথাটীকে চালু রাখা হইয়াছে। চালু রাখার অন্যতম কারণ হইতেছে, পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। দুইটী কারণ পরস্পরের সহিত এমন ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া গিয়াছে যে, কোন্‌টীর প্রাধান্য চলিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু এগুলি কর্মকাণ্ড।

কর্মকাণ্ড জ্ঞানের ধার ততটা ধারে নাই, যতটা সম্মান করিয়া চলিয়াছে প্রথাকে। একটী কুলপ্রথার উপরে আর একটী কুলপ্রথা, একটী লোকপ্রথার উপরে আর একটী লোকপ্রথা চাপাচাপি ঠাসাঠাসি করিয়া যুগের পর যুগ ধরিয়া কেবল পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। কেন এই পুঞ্জায়ন, জ্ঞানকে আসিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বা এই প্রশ্নের জবাব দিতে অবসর দেওয়া হয় নাই। এই ভাবেই অতি আদিম কালের প্রথাংশের সহিত অতি আধুনিক প্রথাংশসমূহ জড়াইয়া মিশাইয়া এক অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে আচার আছে বিচার নাই, নিয়ম আছে লক্ষ্য নাই, কর্ম আছে মর্ম নাই। অবশ্য, অবিচলিত বিশ্বাস নিয়া এগুলি পালন করিলেও 'ধর্ম নাই' এমন বলিতে পারিব না। কারণ, বিশ্বাসই ধর্মের জনক, ধারক, বাহক ও প্রবর্ধক।

যুক্তির সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে যে সকল প্রথা গলার কাঁটার মত ক্লেশকর বোধ হইবে, তাহা তোমরা নিজেদের প্রাণের তাগিদ বুঝিয়া পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে পার। কিন্তু শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য যে পিতৃগণের প্রতি অন্তরের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাহা হইতে নিজেদের দূরে সরাইয়া নিতে পার না। কারণ, তাহা করিলে তোমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব হইয়া যাইবে।" (ধৃঃ প্রেঃ ৭ম খণ্ড পত্র ২৭.)

আলাদা আলাদা শ্রাদ্ধ

"তোমার বড় ভাইরা যদি অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধ সম্পাদনে মনে শান্তি না পান, তাহা হইলে তাঁহাদের মনে আঘাত দিয়া তুমি জোর করিয়া তাঁহাদিগকে অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধ করিতে বাধ্য করিও না।

কিন্তু তাঁহারা যদি প্রচলিত মতে শ্রাদ্ধাদি এখানেই বা অন্যত্র করেন, তাহা হইলেও তুমি অন্যত্র বা এখানেই ইচ্ছা করিলে অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিতে পার। এক জনের পুত্র যদি দশ জন দশ দেশে থাকেন, তাহা হইলে মাতার বা পিতার মৃত্যুর পরে দশটী স্থানেই দশটী পুত্র বা কন্যা আলাদা আলাদা করিয়া অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। দেশপ্রচলিত স্মার্ত মতেই কেবল জ্যেষ্ঠের শ্রাদ্ধাধিকার এবং এক জনে শ্রাদ্ধ করিলে অন্যদের তাহা করিতে হয় না। অখণ্ডমতেও এক স্থানে এক পুত্র অখণ্ড বিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলে অন্যান্য পুত্রদের অন্যত্র শ্রাদ্ধের বাধ্য-বাধকতা নাই। কিন্তু প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে করিলে দোষ নাই। আর, এক স্থানে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে অন্যান্য স্থানে সকল পুত্রদের সে সময়ে শ্রাদ্ধোচিত মন লইয়া থাকিতে হইবে।" (প্রঃ আষাঢ় ১৩৬১ পৃঃ ২৩০)

আত্মহত্যাকারীর শ্রাদ্ধ

"তোমর পত্রে তোমার ষোড়শবর্ষ-বয়স্ক পুত্রের অকালে পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া ব্যথিত হইলাম। অধিকতর ব্যথিত হইলাম এই সংবাদ জানিয়া যে, সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তোমাদেরই গ্রামে ঠিক এই বয়সেরই আর একটী ছেলে প্রায় ত্রিশ বছর আগে এই ভাবেই প্রাণ দিয়াছিল। ছেলেটি ছিল তোমারই গুরুভাই।—— এখনো আমি সেই একটী হতভাগ্য ছেলের জন্য প্রাণে বেদনা অনুভব করি। মরিয়া তাহার কিছুই লাভ হইল না। নিজ কর্মফলহেতু যে দুঃখ বা অশান্তি সে জগতে ভুগিতেছিল, মৃত্যুর পরেও তাহা তাহাকে ছাড়ে নাই। মরিয়াও সে কর্মফলেরই অধীন হইয়া রহিয়াছে। কর্মের ফল ভুগিয়া তাহাকে নিঃশেষ

করিবার জন্য আবার তাহাকে মানব তনুই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যেই মানব-জীবনের অবশ্যম্ভাবী অশেষ দুঃখ তাহাকে করিয়াছিল পীড়িত ও নিগৃহীত, সেই মানবজীবনের মধ্য দিয়াই তাহাকে আবার বাকী ভোগ পুরাইতে হইবে। তবে তাহার প্রাণত্যাগ করিয়া লাভ হইল কি ? —— তুমি তোমার শোক কমাও বাবা, তুমি অবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হল।——

তোমার পরলোকগত পুত্রের আত্মার শান্তির জন্য যত শীঘ্র সম্ভব একটী সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান কর। ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী সংস্কারাচ্ছন্ন মন আত্মহত্যাকারীর জন্য শ্রাদ্ধের বিধান দেয় নাই। আবার, এই ভাবে অন্যায় মরণ যাহারা বরণ করে, তাহাদের শ্রাদ্ধাদি বিধান করিলে যদি দলে দলে লোক, শ্রাদ্ধের দ্বারা স্বর্গ লাভ হইবেই, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কেবলই গলায় দড়ী দিতে বা বিষপানাদি করিতে থাকে, তাহার ভয়েও ইহাদিগকে স্মার্তশ্রাদ্ধের তৃপ্তি ও সুখটুকু হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কিন্তু আমি মনে করি, ইহাদের প্রতি এরূপ আচরণ নিষ্ঠুরতা মাত্র। যে ছেলে টাইফয়েডে মরিলে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া শ্রাদ্ধ করা সঙ্গত হইত, সেই ছেলে বুদ্ধির ত্রুটিতে অসঙ্গত উপায়ে দেহ ছাড়িয়াছে বলিয়াই তাহার শ্রাদ্ধ হইবে না ? তুমি অনতিবিলম্বে একটী দিন বাছিয়া লইয়া সেই দিনে সকলকে লইয়া তাহার আত্মার শান্তির জন্য সমবেত অখণ্ডোপাসনা কর। ইহাতে তোমার পুত্রের আত্মার শান্তি হইবে, তোমাদেরও শোক অপনোদিত হইবে।

ভগবান্ যখন যাহার মৃত্যুর জন্য যে সময় নির্ধারণ করিয়া থাকেন, তখনই তাহার মৃত্যু হয়, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিকেরা আসিয়া অসির আঘাত করিতে চাহিলেও

ইহা আমরা ছাড়ি নাই । কারণ, ইহা আমাদের অন্তরে শান্তি দেয় । তবে কেহ নিজের ইচ্ছায় অন্যায্য ভাবে শরীর-পাত করিলে তাহার জন্য অবশ্যই দুঃখ স্বাভাবিক । কিন্তু যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য চিরকালই শোক করা চলে না, উচিতও নহে । সেই শোক অপনোদনের পক্ষে শ্রাদ্ধ একটী অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ভেষজ । অবিলম্বে সমবেত উপাসনার দ্বারা অখণ্ড মতে তাহার শ্রাদ্ধ-শান্তি করিবার ব্যবস্থা কর ।" (ধৃঃ প্রেঃ ১০ম খণ্ড পত্র ৩)

অপমৃত্যুতে শ্রাদ্ধ

"তোমার পত্রে তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ র-র অকাল পরলোকগমনের সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম । মাত্র সাত বৎসর বয়সে সে ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেল, ইহাতে প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিল । কত সম্ভাবনাই না নিয়া সে আসিয়াছিল । কেন আসে, কেন যায়, মানুষ তাহা জানে না । আসিলে আনন্দ করে, চলিয়া গেলে কাঁদিয়া আকুল হয় । বান্ধবেরা সান্ত্বনা দেয়, সহানুভূতি দেখায়, কিন্তু যে যায়, সে আর আসে না । ইহার মধ্যে ভগবানের কি যে এক অনির্বচনীয় অভিপ্রায় রহিয়াছে, মাত্র তাহার কথা ভাবিয়া নতশিরে তাহা মানিয়া লইতে হয় । তোমার, বিশেষ করিয়া আমার কল্যাণীয়া মায়ের, এই নিদারুণ শোকে কি যে সান্ত্বনা দিব, তাহারই ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না । তবে আমার ভৌতিক অস্তিত্বের চাইতে ও একটা বড় অস্তিত্ব আছে, যাহাতে আমি জগতের সকলকে অনন্তকাল ধরিয়া বুকে বেড়িয়া রাখিতেছি । তোমার খোকা আমার সেই ক্রোড়ে আসিয়া বসিয়াছে । ইহা বিশ্বাস করিয়া, মনকে যত দ্রুত পার, ভারমুক্ত কর ।

ছেলেটী জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে । তোমাদের ওখানকার

পণ্ডিতেরা হয়ত বলিতেছেন যে, ইহা অপমৃত্যু, অতএব শ্রাদ্ধ হইবে না । সাধারণে তাঁহাদের কথা শুনুক । কিন্তু তোমরা আমার সন্তান, তোমরা আমার কথা শুনিবে । যে যুগে যে শাস্ত্র রচনা হইয়াছিল, সেই যুগের লোকের প্রয়োজন বুঝিয়া সেই যুগের ঋষিরা তাহা রচনা করিয়াছিলেন । তাহাতে যদি পরবর্তী কোনও যুগের প্রয়োজন না মিটে, তাহা হইলে পরবর্তী যুগে আবার নূতন শাস্ত্র রচনা হইয়াছে বা পূর্বেকার শাস্ত্রের উপরে নূতন ব্যাখ্যা-সংযোজন ঘটিয়াছে । প্রচলিত শাস্ত্রীয় মতবাদ যদি তোমার জলে-ডোবা ছেলেটার শ্রাদ্ধে আপত্তি করিয়া থাকে, তোমাদের তাহাতে ভাবনার কিছুই নাই । তোমরা অখণ্ডমতে ইহার শ্রাদ্ধ করিবে ।—— এই ব্যাপারে তোমার মনে কোনও কুণ্ঠা থাকার প্রয়োজন নাই । কেহ দেহ ছাড়িলে অন্তরে যে বিপুল শোক উপজাত হয়, তাহা শান্ত করিবার জন্যও শ্রাদ্ধ নিতান্তই প্রয়োজন । ছেলে জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে বলিয়াই তাহার আত্মার শান্তির জন্য কিছুই করা চলিবে না, ইহা আগেকার দিনের অন্ধ মত, যাহা তোমাদের মানিবার প্রয়োজন নাই । শ্রাদ্ধে আত্মার শান্তি হয়, সকল মতের শ্রাদ্ধেরই ফল এক ।" (ধৃঃ প্রেঃ ১০ম খণ্ড পত্র ৪৯)

বিপথগামিনীর শ্রাদ্ধ

"সমাজ-বিধানানুযায়ী কোনও কর্তব্য আছে বলিয়া মনে হয় না । যে মাতা খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইয়া যেই সমাজভুক্তা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে সেই সমাজের লোকেরাই যাহা করিবার করিবেন । পুত্র যখন মুসলমান বা খ্রীষ্টান হয় নাই, তখন তাহার কিছুই কর্তব্য নাই ।

কিন্তু ইহা এক দিকের বিচার ।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

মাতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে যদি পুত্রের মনে বেদনার সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিধর্মিণী মাতারও আত্মার শান্তি কামনা করিয়া পুত্র তাহার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য কাজ করিতে পারে । অবশ্য, সমাজ কখনো এই জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চাহিবেন না, নতুবা পতিতা মাতার জন্যও পুত্র নিশ্চয়ই নিজের গরজে পারলৌকিক কাজ করিত । বিধর্মী হইলে বা পতিতা হইলে তাহার জন্য পুত্রও কিছু করে না, ইহা দেখাইয়া সমাজ এই সকল পাপ নিবারণেরই পরোক্ষ চেষ্টা করিয়াছেন ।

কিন্তু আরও একটা দিক আছে । মাতা পুত্র ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে, তিনি যে কত কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রসব করিয়াছিলেন এবং কত স্নেহ করিয়া পালন করিয়াছিলেন, তাহা ত মিথ্যা হইয়া যায় না । এমন কি মাতা যদি জন্মমাত্রও কোনও সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলেও পুত্রের সুপুত্র হইবার চেষ্টা করিতে হইবে । মাতা কুমাতা বলিয়াই সুপুত্র তাহার আত্মার পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করিবে না, তাহার তাপদগ্ধ আত্মার শান্তি প্রার্থনা করিবে না, ইহা কোনও উচ্চাদর্শ হইল না । মা নৃশংস হইয়াছেন বলিয়া পুত্রও নিষ্ঠুর হইবে, ইহা নিতান্ত নিম্ন জগতের কথা । আমাদের লক্ষ্য উন্নততর জগৎ ।

মাতা বিধর্মী হইলে বা বিপথ-গামিনী হইলে সন্তান তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য করিবে না, ইহা পাপ কমাইবার জন্যই সামাজিক ব্যবস্থা । কিন্তু সকল অবস্থায়ই মাতার আত্মার শান্তির জন্য পুত্র ব্যাকুল হইবে, ইহা মাতাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার পক্ষে অধিকতর উন্নত ব্যবস্থা । অবশ্য ইহাকেই প্রকারান্তরে পাপের সমর্থন বলিয়া ব্যাখ্যাও যে করা যায় না, তাহা নহে ।

এই সকল স্থলে পুত্র তাহার মাতার আত্মার শান্তির জন্য যে

কোনও পারলৌকিক কার্যানুষ্ঠান করুক, তাহা সমস্ত সমাজের লোককে লইয়া না করিয়া নিজ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের লইয়াই করিবে। (প্রঃ অগ্রঃ ১৩৬০ পৃঃ ৫১৩)

মৃত্যুর পরে

"মৃত্যু দেহেরই হয়, আত্মার হয় না । সুতরাং মৃত্যুর পরে আত্মা থাকেন । দেহধারী অবস্থায় জীব যেই সকল কাজ করিয়াছেন, সংস্কার রূপে তাহার প্রতিফলন আত্মার উপরে থাকিয়া যায় । এই সংস্কারগুলির ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত আত্মা সংস্কারের অধীন হইয়া বারংবার জন্ম-মরণ দুঃখবরণ করেন । জড় দেহ ত্যাগ মাত্রই আত্মাকে সংস্কার অনুযায়ী নূতন দেহ-ধারণ করিতে হয় । পুরাণাদিতে স্বর্গ-নরকাদি ভোগের যে কাহিনী আছে, তাহা আক্ষরিক ভাবে সত্য নহে, রূপক-মাত্র । সুখ-দুঃখাদি ভোগ সম্পূর্ণরূপে কাল-নিরপেক্ষ এবং তাহা একান্তই মানস-সংস্কার-সঞ্জাত । মৃত্যুর পরে কোন আত্মাই কোন আত্মার আত্মীয় থাকে না । প্রত্যেকেই পরমাত্মার আত্মীয় হইয়া পড়ে । জীবৎকালে যাহাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছি মরণের পরে যদি তাহাদের সঙ্গে দেখা হইত, তাহা হইলে হয়ত পরলোকেও ফৌজদারী কোর্টের আবশ্যক হইত । প্রত্যেক জীবই কর্মানুসারে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহান্তর পাইতেছে । অতএব মৃত্যুর পরে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎকার সম্ভব নহে । কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের চিত্ত-সংস্কার ছায়ারূপে ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া থাকে । তাহার সাক্ষাৎকার অনেকের হইয়া থাকে । সেই সাক্ষাৎকারও নিজ নিজ সংস্কারানুগ হয় । প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক আত্মাই নিজ নিজ পরম অভিলষিতের পথে চলিতে থাকে । কাহার সঙ্গে কবে কুটুম্বিতা হইয়াছিল, ইহা স্মরণ রাখিবার অবকাশ তাহার থাকে

না। এক অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের আকর্ষণে আত্মা ছুটিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন আত্মার সহিত বিভিন্ন জড়দেহে তাহার যে পরিচয় হইতেছে, তাহার মূল প্রয়োজন পরমপ্রেমময়কে লইয়া। তাই মৃত্যুর পরে ইহ-জীবনের আত্মীয়কে দিয়া তাহার আর কোন প্রয়োজনই নাই।

প্রচলিত মত এবং বিশ্বাসের সহিত কথাগুলি মিলিবে না। কিন্তু ইহা আমার উপলব্ধির কথা। তোমাকে অকপটে না লিখিয়া পারিলাম না।" (ধৃঃ প্রেঃ ৯ম খণ্ড পত্র ২)

পাতকীর শ্রাদ্ধ

"ম-র স্ত্রী মরিয়া বাঁচিল। চিন্তাশীল, কবি, ভাবুক ও প্রেমবান স্বামীর ঘর করিয়া যে দুইটী ছেলে আর একটী মেয়ের বা হইল, সে যে স্বামীর নিরুদ্দেশের পরে বিপথে চলিতে পারে, ইহা কাহার ধারণায় ছিল? তোমরা তাহাকে ভরণ-পোষণের আশ্বাস দিয়াছিলে, সে কর্ণপাত করে নাই। নির্লজ্জ পাপের পথই সে দম্ভের সহিত বাছিয়া লইল। এমন নারীর মৃত্যুর পরে শবদাহ করিবার লোকের অভাব হওয়া কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। তবে তোমরা দুই চারিজন যে সৎসাহস দেখাইয়া ইহার শব দগ্ধ করিয়াছ, ইহাতে আমি সুখী হইয়াছি। পাতকী বলিয়া কল্যাণবুদ্ধিতেই যাহার সংস্রব হইতে তোমাদের দূরে থাকিতে হইয়াছে, তাহারও মৃতদেহের সহিত কলহ কেন করিবে? কৃপার পাত্রকে কৃপা করিয়া প্রেম-বিগলিত হৃদয়ে তোমরা তাহার আত্মার উদ্ধার কামনা কর। প্রচলিত মতে তাহার শ্রাদ্ধ করিতে সমাজ বাধা দিলে অখণ্ডমতে হইলেও তাহা করিও। তোমাদের কাছে মহাপাতকীরও মৃত্যুর পরে ক্ষমা

আছে। তাহার শিশুগুলিকে রক্ষা করিও।" (ধৃঃপ্রেঃ ১৪শ খণ্ড পত্র ৬৫)

অশৌচ

১। "অশৌচ-সম্পর্কে আমাদের ধারণা যুগোপযোগী। মৃতদেহ দাহান্তে স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাদ্ধাধিকারীগণ ব্যতীত অপর সকলের অশৌচ-মুক্তি ঘটিল। শ্রাদ্ধীয় উপাসনায় বসিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাদ্ধাধিকারীদের অশৌচ-মুক্তি ঘটিল। (ধৃঃ প্রঃ ৩৭শ খণ্ড পত্র ৫১)

২। "অঞ্জলি দান অশুচি শরীরে উচিত নহে। —— কোনও মৃতদেহ বা ব্যাধিগ্রস্ততা হেতু অশুচি দেহ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছ। এমতাবস্থায় স্নানাদি না করিয়া অঞ্জলি দিতে পার না। অবশ্য, মৃতসৎকার কালে শবের বক্ষে বিগ্রহ রাখিয়া যখন অঞ্জলি দিতেছ, তখনকার কথা বলা হইতেছে না।

অতি নিকট আত্মীয় মারা গেলেও মৃত-সৎকারের পরে স্নান সারিয়াই তুমি বিগ্রহে অঞ্জলি দিতে পার।" (ধৃঃ প্রেঃ ৮ম খণ্ড পত্র ৬৪)

রুগ্ন বা মৃতের কল্যাণে উপাসনা

"যখন শুনিবে, কেহ রুগ্ন বা কেহ দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পরে যত শীঘ্র সম্ভব একটী উপাসনা-সভার অনুষ্ঠান করিবে। সময়ের ও সুযোগের অভাব হইলে সাপ্তাহিক উপাসনা অধিবেশনকেই উক্ত উদ্দেশ্যের অনুষ্ঠান-রূপে গ্রহণ করিবে।

কোনও বক্তৃতা দিবে না, সভা-সমিতির পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী কোনও প্রস্তাব আনয়ন করিবে না, কেহ সভাপতি থাকিবে না। আমন্ত্রিত সকলে আসন পরিগ্রহ করিলে সম্পাদক জানাইয়া দিবেন, কাহার রোগারোগ্যের জন্য বা কাহার পারলৌকিক কল্যাণের জন্য উপাসনা হইতেছে। তৎপরে যথানিয়মে উপাসনা করিবে। তোমরা যে এতদুদ্দেশ্যে উপাসনা করিয়াছ, তাহা রুগ্ন ব্যক্তিকে বা পরলোকগত ব্যক্তির আত্মীয়বর্গকে সহানুভূতিপূর্ণ পত্রের দ্বারা জানান হিতকর। ইহাতে রুগ্নের সাহস বাড়ে, শোকার্তের শোক কমে"
(অঃসঃ ১১শ খণ্ড ৪র্থ সং পৃঃ ১৩৭)

❦ ❦ ❦

অখণ্ড-সংহিতা ও শ্রীশ্রীবাবামণির অন্যান্য অমূল্য রচনাবলী হইতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পাঠোপযোগী সুনির্বাচিত অংশসমূহ সমবেত উপাসনায় পাঠের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ-

শোকাবেগ দূর কর (প্রঃ ভাঃ ১৩৭০ পৃঃ ৪৭৩)

"কেবল শোকে কোনও কুশল হয় না। শোক যখন চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়, তখনই শোক সার্থক। ভগবৎ-প্রীতিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দেখা যায়, শোককে অন্তরের মলিনতা নাশের কার্যে সার্থক করিতে। জগতে কেহই কাহারো জন্য চিরকাল থাকে না, যাহার যখন সময় হয়, তখনই সে চলিয়া যায়। যাইবার কালে তাহার হিসাব-নিকাশ করিবার অবকাশ থাকে না যে, কে হাসিল, কে কাঁদিল। তুমি আমি সকলেই যাইবার কালে এ ভাবেই চলিয়া যাইব। সুতরাং শোকাবেগ দূর কর। শোকশুদ্ধ অন্তরে ভগবানকে ডাক, দেখিও, সে ডাক আগের মায়ামুগ্ধ ডাকের চেয়ে কত মিষ্টি শোনায়।"

শোক প্রশমনের উপায়

(ধৃঃ প্রেঃ ২য় খণ্ড পত্র ৩৫)

"পিতৃবিয়োগে তুমি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছ কিন্তু মা জন্ম আর মৃত্যু উভয়ই ত সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেচ্ছাধীন ব্যপার। ভগবান যখন তোমাকে বা আমাকে এই পৃথিবী হইতে টানিয়া

নিয়া যাইবেন, তখন কি আমরা প্রতিবাদ করিব ? মরণ ত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া নয়, মৃত্যু ত দেহান্তর আশ্রয় বা ব্রহ্মসমাধি লাভ । ভগবানের সহিত মিলিয়া যাওয়ার মত শ্লাঘ্য সুখ আর কি আছে? যাঁর কাছ হইতে আসিয়াছিলেন, তোমার বাবা তাঁর কাছেই চলিয়া গিয়াছেন । সংসারের রোগ-শোক আর তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না । তিনি নিত্যানন্দধামে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি শ্রীভগবানের ক্রোড়দেশে আশ্রয় পাইয়াছেন । তাঁর জন্য আবার শোক করিবে কেন ?

তথাপি রক্তমাংসের স্বভাবে শোক আসে । কিন্তু সেই শোক-প্রশমনের সাত্ত্বিক পন্থাও আছে । তুমি অবিলম্বে সমাজ-সেবায় লাগিয়া যাও । জীবের সেবায় নামিলে মনের সঙ্কীর্ণতা নাশ পায় । তখন নিজেকে কেবল একটা মাত্র সংসারের বা পরিবারের প্রতিনিধি বলিয়া ভাবিতে কুণ্ঠা আসে । জীবের সেবায় নামিলে বিশ্বের সকলের সহিত কুটুম্বিতা-বোধ জাগিয়া ওঠে । তখন প্রতিজনের দুঃখ-কষ্টে মন একদিকে উদাস এবং অন্যদিকে করুণ-রসাশ্রিত হইয়া ওঠে । ইহার ফলে নিজের ব্যক্তিগত শোক-দুঃখ জগদ্বাসী সকলের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া নূনের পুতুলের সমুদ্রের জলে আপন হারাইয়া যাওয়ার মত একেবারে বিলীন হইয়া যায় । জীবকে, সমাজকে, জগৎকে সেবা করিবার ভিতরে সর্বশোকহর এক মহৌষধ আছে ।"

মৃতের আত্মার শান্তির জন্য নামজপ

(অঃ সঃ ২য় খণ্ড ৫ম সং পৃ ১০২)

"প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্যত' নামজপ চলতে পারে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি ঃ নিশ্চয়ই পারে এবং এই উদ্দেশ্যে নামজপ প্রশস্ত বলে সাধক-সমাজে পরিগৃহীতও হয়েছে । অপরের মঙ্গলের জন্য নামজপ সর্বসময়েই প্রশস্ত । তবে জপকালে মৃতব্যক্তির অবিরাম চিন্তা না করে জপারম্ভকালে শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জানিয়ে নেবে, - 'হে ভগবান, অমুকের আত্মার পরলৌকিক শান্তির কামনায় তোমার পবিত্র নামজপ কত্তে বসলুম, তুমি দয়া করে তোমার নামে আমার গভীর অভিনিবেশ দাও এবং প্রতিটিবার নাম জপ করার অশেষ সুফল এই পরলোকপ্রস্থিত আত্মাকে দান কর ।' এইভাবে জপ সুরু কর্বে ।"

শ্রাদ্ধ কাহাকে বলে

(প্রঃ আষাঢ় ১৩৭০, পৃঃ ২২৯)

"পিতামাতার চরিত্রের সদ্‌গুণসমূহের চিন্তা করিয়া নিজের জীবনে সেই সকল সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটুক, এই সঙ্কল্প নিয়া তাঁহাদের আত্মার তৃপ্ত্যর্থে শ্রদ্ধাপূর্বক দেবকর্মাদি সমাপনের নাম শ্রাদ্ধ । শ্রাদ্ধ কেবলই একটা সামাজিক প্রথামাত্র নহে, ইহা শোকাপনোদনের জন্য মনস্তাত্ত্বিক শুচিতাপ্রদ এক অমোঘ উপায় এবং আত্মপরীক্ষণ তথা আত্মসংযমের দ্বারা নিজের ভিতরে পূর্বপুরুষগণের সাধনাকে সিদ্ধিমন্ত করিবার জন্যএক দুর্বার সঙ্কল্প । প্রথাগত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে না দেখিয়া শ্রাদ্ধকে এক আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়ের আরাধনা বলিয়া জ্ঞান করিও । যে যেভাবে শ্রাদ্ধ করিতে আনন্দ পায়, তাহার সেই ভাবে করাই সঙ্গত । সকল মতের শ্রাদ্ধেই কুশল সমান, যদি অন্তরের শ্রদ্ধা সুগভীর হয় ।"

শ্রাদ্ধ (প্রঃ চৈঃ ১৩৭৯ পৃঃ ১০৭১)

“পিতার ও মাতার অশেষ সদ্‌গুণ সমূহের পরিবিকাশ নিজ জীবনের মধ্যে ঘটাইয়া যাওয়ার ধারাবাহিক চেষ্টার নাম শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ নামীয় একদিনের একটী অনুষ্ঠান দিয়া তাহার প্রারম্ভ কিন্তু সমগ্র জীবন জুড়িয়া অনুশীলনের চেষ্টার মধ্য দিয়া তাহার বিস্তার ও বিকাশ। এই একটী কথা মনে রাখিলে, পিতা ও মাতা মানুষের নিকটে সাধারণ মানুষ না থাকিয়া একটা আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইবেন। তখনই পিতা দেবতা হইবেন, মাতা দেবতা হইবেন। এই জন্যই প্রাচীন কালের উপদেশ পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব।”

মৃত ব্যক্তির মঙ্গলার্থ জপযজ্ঞ

(অঃ সঃ ১০ম খণ্ড ৪র্থ সং পৃঃ৩০)

“তোমার প্রিয়জন-বিয়োগে আমি আমার অকপট সমবেদনা এবং সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু তুমি শোকার্ত হইয়া সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়াছ জানিয়া বেদনানুভব করিতেছি। সম্যক্‌ ঈশ্বর-নির্ভর না আসা পর্যন্ত কেহ শোক-জয় করিতে পারে না। এজন্য আমি আশীর্বাদ করিতেছি যে, দ্রুত তোমার ঈশ্বর-নির্ভর সম্যগ্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হউক এবং তুমি বিগতশোক হও। কিন্তু ইতিমধ্যে শোকার্ততাহেতু অবিরাম হা-হুতাশ করিয়া জীবনের অমূল্য সময় বৃথা অতিবাহন না করিয়া, পরলোকপ্রস্থিত প্রিয়জনের আত্মিক কুশলের লক্ষ্যে তুমি মঙ্গলময় ভগবানের নাম-জপে নিরত হও। আত্মীয়ের কাছে আত্মীয় নিশ্চিতই ইহপর-জীবনে সাহায্য প্রত্যাশা করিয়া থাকে। তোমার স্বর্গত প্রিয়জন সমগ্র জীবনে স্বেচ্ছায়

বা অনিচ্ছায় যে সকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য পবিত্র যপযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। প্রথম এক লক্ষ নামজপ তাঁহার মিথ্যাচরণজনিত পাপ হইতে মুক্তির জন্য অনুষ্ঠান কর। দ্বিতীয় এক লক্ষ জপ তাঁহার সর্ববিধ পরপীড়ন জনিত পাপ হইতে মুক্তির জন্য অনুষ্ঠান কর। তৃতীয় এক লক্ষ জপ তাঁহার সর্ববিধ স্বার্থপরায়ণতার সংস্কার-মুক্তির জন্য অনুষ্ঠান কর। চতুর্থ একলক্ষ জপ তাঁহার পরবর্তী জীবনে ‘যোগিনাং শ্রীমতাং গেহে’ জন্মগ্রহণের সুচারুতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান কর। পঞ্চম একলক্ষ জপ তাঁহার পরবর্তী দেহে সর্বতোভাবে ভগবৎ-সমর্পিত চিত্তে জীবকল্যাণকল্পে নিরত থাকার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান কর। ষষ্ঠ একলক্ষ জপ তোমার ও তাঁহার পার্থিব সম্বন্ধের ভিতরে যত মানস সংস্কার অজ্ঞাতসারে কল্যাণ-বিরোধী হইয়া জাত হইতেছিল বা হইয়াছিল, তাহাদের অবসান-কামনায় অনুষ্ঠান কর। সর্বশেষ একলক্ষ জপ তোমার, তাঁহার এবং নিখিল ভুবনের প্রত্যেক প্রাণীর আত্মকল্যাণের ভিতর দিয়া আত্মকল্যাণের আহরণ কল্পে প্রেরণা জাগরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান কর। এই সাতলক্ষ নামজপ তোমাকে ও তাঁহাকে নরক হইতে উদ্ধার করিবে, তোমাকে অশোক ও বিগতভয় করিবে। যাহা বলিলাম, তাহাকেই প্রকৃত শ্রাদ্ধ বলিয়া জ্ঞান কর।”

মরণ-অবশ্যম্ভাবী

(অঃ সঃ ৪র্থ খণ্ড ৫ম সং পৃঃ ৫৫)

“লোকে শ্মশানকে ভয়ের স্থান বলে মনে করে থাকে। কেননা, মৃত্যুর সাথে এর সম্বন্ধ নিবিড়। কেউ ত’ জগতে মরতে চায় না, সবাই চায় বেঁচে থাকতে। জীবনের প্রতি যার মমত্ব যত

অধিক, শ্মশানের প্রতি বিদ্বেষ তার তত অধিক । কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ, প্রত্যেকটী প্রশ্বাসের সাথে সাথে আমরা মৃত্যুর আস্বাদন কচ্ছি, প্রত্যেকটী মুহূর্তের সাথে সাথে আমরা মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হচ্ছি, হৃদয়ের প্রত্যেকটী স্পন্দন নিরন্তর মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে । অর্থাৎ বাঁচতে যতই চাও, মৃত্যু তোমার অখণ্ডনীয় ভবিতব্য । এর হাত কেউ এড়াতে পারবে না । মরণ অবশ্যম্ভাবী । কোন্‌দিন কার যে শেষ প্রশ্বাস ছাড়বার সময় হবে, তার কোন স্থিরতা নেই ।

কিন্তু মরণের হাত এড়াবার উপায় না থাকলেও মরণকে সার্থক করার উপায় আমাদের হাতে আছে । বেঁচে ত' আমরা সকলেই আছি । কিন্তু জীবন সার্থক আমাদের ক'জনের ? প্রত্যেকটী নিঃশ্বাসকে জানবে জীবনের প্রতিনিধি, প্রত্যেকটী প্রশ্বাসকে জানবে মরণের প্রতীক । এদের সাথে সত্যময় ভগবানের মঙ্গলময় নামটী যুক্ত করে নাও । জীবনও সার্থক হবে, মরণও সার্থক হবে । অসার্থক জীবনের বোঝা বয়ে যে বেড়ায়, অসার্থক মরণের অপবাদ থেকে মুক্তি পাবার তার উপায় নেই । জীবনে ও মরণে অর্থাৎ শ্বাসে ও প্রশ্বাসে সর্বমঙ্গলনিলয় ভগবানের প্রেমমধুমাখা নামকে আলিঙ্গন করে ধর । তাতে জীবনও সফল হবে, মরণও সফল হবে ।"

মৃত্যু ভয়ের কারণ

(অঃ সঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪র্থ সং পৃঃ ৩৬৩)

"মৃত্যুকে লোকে অত ভয় করে কেন জানিস্ ? তারা জানে না, মৃত্যু জিনিষটা কি । মৃত্যুতে কি তোমার ধ্বংস হয়, না, তুমি নবজীবন পাও ? তাতে কি তোমার অবসান ঘটে, না, আরম্ভ

হয় ? মৃত্যুতে কি তুমি কিছু হারাও, না লাভ কর ? মৃত্যুতেই কি তোমার সব কিছু শেষ হয়ে যায়, না, অখণ্ড-জীবনের দুয়োর খুলে যায় ? এই অজ্ঞানতাই মৃত্যুকে ভয়ের জিনিষ করে রেখেছে । যেমন অন্ধকার রাত্রে তোমার পথ চলতে ভয় করে কিন্তু হাতে আলো থাকলেই ভয় দূরে যায় । অজ্ঞানতাই ভয়ের জনক । মৃত্যুর মাঝে ভয়ের কিছু নেই ।

চিরকাল বেঁচে থাকাটা অস্বাভাবিক, মৃত্যুটাই স্বাভাবিক । যেমন তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা স্বাভাবিক, আহার-নিদ্রা স্বাভাবিক, মৃত্যু তেমনি স্বাভাবিক । স্বাভাবিক ব্যাপারকে ভয় করা ভুল । মৃত্যু তোমার প্রয়োজন, নইলে দীর্ঘকাল একটা জীর্ণ, রুগ্ন, অকর্মণ্য দেহের বোঝা বইতে বইতে শেষে তোমার সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যেত । মৃত্যু আছে বলেই জরা-ব্যাধির হাত থেকে তুমি রক্ষা পাও । নীরোগ চিরযৌবন যদি না পাওয়া যায়, তা হলে অশ্বত্থামা বা হনুমানও প্রত্যহ মৃত্যুকামনা কত্তেন । মৃত্যুর মানে কি ? দেহের পরিবর্তন ছাড়া ত' মৃত্যু আর কিছুই নয় । পুস্তকের যেমন একটা মলাট ছিঁড়ল, তুমি আর একটা মলাট পরিয়ে নিলে । পরিধানের একখানা বস্ত্র ছিঁড়ল, তুমি আর একখানা বস্ত্র পরিধান কর্লে । কাপড় পুরাণো হলেই তাকে ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন হবে । যা প্রয়োজন, তাতে আপত্তি করা ভুল । ছেঁড়া কাপড় ফেলে দেবার জন্য তৈরী হয়ে থাকাই সঙ্গত । মৃত্যু সর্বজনীন । কার মৃত্যু হয় নি ? রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, সব ঈশ্বরাবতারের সঙ্ঘ, দেহত্যাগ করেন নি ? কেউ হয়ত দীর্ঘকাল বাঁচেন, কেউ অল্পকাল বাঁচেন । কিন্তু সবাইকে মরতে হয়েছে । সুতরাং যা সর্বজনীন, তার সঙ্গে মনেই হোক, আর বাক্যেই হোক, ঝগড়া করা বিষম ভ্রম । মৃত্যুর মানে ধ্বংস নয়, মৃত্যুর মানে

বিবর্তন। শীতকালে অনেক গাছের পাতা পড়ে যায়, আবার বসন্তে কচিপাতা গজায়। মৃত্যুতেও তেমন তোমার পুরাণো শরীর ঝরে পড়ে নূতন কাঁচা কচি সুন্দর শরীর লাভ হয়।

তাই বলে আত্মহত্যার কোনও প্রয়োজন নেই, কিম্বা সেধে গিয়ে মৃত্যুর গ্রাসে গড়িয়ে পড়ারও কোনো মানে নেই। মৃত্যু এসে যায় ত' উত্তম, না আসে ত' জীবনটাকে মানুষের মত মন নিয়ে মানুষের আচরণ দিয়ে ভোগ করে যাও। "কেউ যার দুঃখ দূর কত্তে পারে না, মৃত্যু তারও শান্তিদাতা, কেউ যার বন্ধনচ্ছেদন কত্তে পারে না, মৃত্যু তার স্বাধীনতা-দাতা, কেউ যার রোগ সারাতে পারে না, মৃত্যু তার মহৌষধ" - এইরূপ সব কথা প্রচার করে মৃত্যুকে জনপ্রিয় কর্বার চেষ্টা অনেকে করেছেন। ফলে আত্মহত্যা করার বাতিক বেড়েছে।

কিন্তু আত্মহত্যা করে কেউ কর্মফলের হাত এড়িয়ে যেতে পারে না। যেই দুঃখটা এই শরীর নিয়ে পেতে তোমার আপত্তি, সেই দুঃখটা পরবর্তী শরীরেও তোমাকে পেতেই হবে। সুতরাং যতক্ষণ না স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু ঘটে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজে ইচ্ছে করে মরবার চেষ্টা করে লাভ নেই। যে চেষ্টায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, সেই চেষ্টায় ব্রতী হওয়া ভুল।

জীবন ও মৃত্যুর প্রতি সমভাব রাখ। আসক্তিও নয়, বিতৃষ্ণাও নয়, একেবারে নিরপেক্ষ উদাসীন। জীবৎকালে ভগবান তোমার সাথে এক হয়ে আছেন, এই বিশ্বাস করে দুঃখকে অগ্রাহ্য কর। মরলে ভগবানের সাথে তুমি এক হয়ে যাবে, এই বিশ্বাস করে ভয়কে জয় কর। বিবাহিত ব্যক্তিরা মরতে ভয় পায়। তার মানে কি ? তার মানে হচ্ছে এই যে, সংসারে এরা আসক্ত, আসক্তি এদের অনন্ত জীবনের অনন্ত বিস্তারের কথা বিস্মরণ করাচ্ছে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা সহজেই আত্মহত্যা করে। এর মানে কি ?

এর মানে হচ্ছে, দায়িত্ব জ্ঞানের এদের অভাব এবং ইহকালের কর্মের ফল যে কর্মক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-জন্মান্তরেও তোমাকে অনুসরণ কর্বে, একথায় অবিশ্বাস। কারো জীবনের প্রতি অতিতৃষ্ণা মৃত্যুকে ভয়ের জিনিষ করে রেখেছে। কারো জীবনের প্রতি অতি বিতৃষ্ণা জীবনকে অবাঞ্ছনীয় করে ফেলেছে। কিন্তু তোমরা এই দুই দলের একদলেরও অন্তর্ভুক্ত হতে পার না। তোমরা হবে জীবন ও মৃত্যুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে সমদৃষ্টি। জীবন থাকবার হয়, থাকুক, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার কর্বার জন্যই মাত্র তুমি অধিকারী। মরণ আসবার হয়, আসুক, তাকে বীরের মত নির্ভয়ে আলিঙ্গন করারই মাত্র তুমি অধিকারী। কিন্তু কখন তোমার মৃত্যু হবে বা কতদিন তুমি বাঁচবে, সেই হিসাব তোমার করার কোনো প্রয়োজন নেই।"

আখেরের কথা ভাব (অঃ সঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৩৭৬)

"মুসলমানের আমলনামার আর হিন্দুর চিত্রগুপ্তের মোটের উপরে একই মর্ম। অর্থাৎ, জীবনভরে যে কাজই তুমি কর না কেন, সব-কিছুরই হিসাব-নিকাশ একটা আছে। সুতরাং এখন থেকেই চেষ্টা কর, যাতে হিসাবের খাতায় খারাপ কথা লেখা না হতে পারে। সকল ধর্ম-সম্প্রদায়েরই উপদেশ ঐ এক - আখেরের কথা ভাব, ভবিষ্যতের জন্য হুঁসিয়ার হও। আমল-নামাটা রূপকই হোক, আর চিত্রগুপ্ত ব্যক্তিটি কাল্পনিকই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। হিসাবের যে শোধবোধ কত্ত হবেই, এইটী হচ্ছে আসল কথা সুতরাং শেষের কথা ভাব এবং সেইমত কাজ কর। রঙ-তামাসায় দিন কাটালেই চলবে না, ভবিষ্যতের দিকেও তাকাতে হবে। যে বীজ বপন কচ্ছ, সেই বৃক্ষই জন্মাবে, সেই ফসলই

তুলতে হবে ।

কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে প্রায় কারো দৃষ্টি থাকে না । কারণ, বর্তমানকেই জগতের একমাত্র সত্য বলে তোমরা বিশ্বাস কর । অনিত্য বর্তমানকে চিরস্থায়ী বলে তোমরা ভ্রম কর । বর্তমানের ক্ষুদ্র ভালবাসার তুচ্ছ জিনিষগুলিকেই অমর বলে জ্ঞান কর । তাই ভুলে যাওযে, বর্তমানটা অতীতেরই ফল, আবার ভবিষ্যৎটা বর্তমানেরই ফল । তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন, বর্তমানের আসক্তির জিনিষগুলিকে ক্ষণস্থায়ী বলে উপলব্ধি করার । তাতে ভ্রম দূর হয়, দূরদৃষ্টি বাড়ে, ধীরতা আসে ও আখেরের জন্য তৈরী হতে সামর্থ্য জন্মে । আসক্তি কমাও, আসক্তি কমাও, সকল কাজে লিপ্ত হয়েও নির্লিপ্ততা অবলম্বন কর, পদ্মপাতার জলের ন্যায় নির্লিপ্ত হও, কর্তব্য-জ্ঞানে কাজ করে যাও, ভোগের নেশা বর্জন করে শ্রম কর, - ভবিষ্যতের হিসাব এর ফলে আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে ।"

মৃত্যুভয় নিবারণের উপায়

(অঃ সঃ ৮ খণ্ড পৃঃ ১৪৬)

"একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, - মৃত্যুভয় কি করে নিবারণ কর্ব ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - জীবনকে নিরপরাধ কর, নিজের বিরুদ্ধে আর ভগবানের বিরুদ্ধে যত অপরাধ করেছ, অনুতাপে আর সৎসঙ্কল্পে তার প্রায়শ্চিত্ত কর । নিরপরাধ চিত্ত মৃত্যুকে ভয় করে না । আসক্তিও কমাও । আসক্তি আত্মদানের বিঘ্ন । অনাসক্ত চিত্ত মৃত্যুতে অবিকল্প ।

প্রশ্ন ঃ নিরপরাধ হবার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - নিরপরাধ হবারও যা উপায়, অনাসক্ত হবারও তাই উপায় । ভগবানকে সর্বেশ্বর জ্ঞান করে নিজেকে তাঁর দাসানুদাস জেনে তাঁর প্রীত্যর্থে সর্বকার্য সম্পাদনই হচ্ছে অনাসক্ত হবারও উপায়, নিরপরাধ হবারও উপায় ।"

মৃত্যু ধ্রুব (অঃ সঃ ৮ম খণ্ড ৪র্থ সং পৃঃ ৩২৬)

"এ জগতে এমন মানুষ নেই, যে মরবে না । বহুদেশজয়ী সম্রাটই হও, আর পর্ণকুটীরবাসী ছিন্নকন্থাশায়ী ভিক্ষুকই হও, মৃত্যু কাউকে ছাড়বে না । সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতই হও আর একেবারে নিরেট মূর্খই হও, মৃত্যু সবারই আছে । মৃত্যু যখন অমোঘ, অব্যর্থ, অনতিক্রমনীয়, তখন যা-তা করে মরে না গিয়ে কাজের মত কাজ করে মরাই উচিত । মরণ যখন ধ্রুব, তখন মহদুদ্দেশ্যেই প্রাণত্যাগ কর্তব্য ।"

পূর্ব জন্মের কর্মফল, (অঃ সঃ ৮/৪/২৩০)

"পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মদ্বারা জীবের এই জন্মের আয়ু নির্ধারিত হয় । কেউ দশ বছর, কেউ বিশ বছর, কেউ একশ বছর, কেউ একশ বিশ বছর পরমায়ু নিয়ে আসে । কিন্তু একজন পুলিশ-দারোগার যেমন নির্দিষ্ট একটা মাইনে থাকে এবং চেষ্টা কর্লে সে যেমন উপরিও কিছু উপার্জন কত্তে পারে, তেমন জীব ইচ্ছা কর্লে তার এই জন্মের কর্মের দ্বারাই আয়ুর পরিমাণ আরো কিছু বাড়িয়ে নিতে পারে । কিন্তু সরকারী চাকুরের যেমন নিজের দোষে মাইনে কম্‌তে পারে বা গুরুতর অপরাধে হঠাৎ চাকুরী যেতে পারে, ঠিক তেম্‌নি জীবেরও এই জন্মের কর্মের দোষেই

পূর্বজন্মের কর্মফলে প্রাপ্ত দীর্ঘ আয়ু কমে যেতে পারে বা হঠাৎ মৃত্যুও ঘটতে পারে ।”

সম্মুখে জন্মজন্মান্তর (অঃ খঃ ৮-৪-২৭৫)

“পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফলে এ জন্মে অনেকটা অপটু দুর্বল দেহ লইয়া আসিতে হয় । ইহা এড়াইবার উপায় নাই । কিন্তু তার জন্য মা হতাশ হওয়া নিতান্ত ভুল । সম্মুখেও মা জন্মজন্মান্তর রহিয়াছে । এ জন্মের কর্মের দ্বারা আগামী জন্মের যোগ-সাধনক্ষম দেহ, মন ও অনুকূল অবস্থা সৃজন করিতে হইবে । শ্বাসের জমিতে নামের বীজ বপন করিতে থাক । অহর্নিশ এই কর্মে লাগিয়া থাক। সহস্র সহস্র বীজও যদি বৃথা হইয়া যায়, কোনও ক্রমে একটী মাত্র বীজ যদি অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে, তবেই ত্রিতাপজ্বালা ঘুচিয়া গেল । বীজে প্রেমের বারিসিঞ্চন করিতে হয়, বিশ্বাসের মলয়-হিল্লোল লাগাইতে হয়, তাহা হইলে ইহা সহজেই মহা-মহীরুহে পরিণত হইবে ।”

পরলোক প্রস্থিতের জন্য প্রার্থনা

(অঃ সঃ ৯-৪-৯)

“এরা যার যার নিজ নিজ কৃতিত্বেই কল্যাণকে করায়ত্ত করবে । নিজে যে নিজেকে উদ্ধার করে না, কে তাকে উদ্ধার কর্বে ? প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মানুযায়ী উত্তমা গতি প্রাপ্ত হয় । কিন্তু তথাপি তোমাদের এ প্রার্থনার একটা উপযোগিতা রয়েছে । প্রথম লাভ তোমাদের নিজ নিজ চিত্তের উৎকর্ষ; দ্বিতীয় লাভ এই যে, তোমাদের সকলের সম্মিলিত চিন্তার শক্তি গিয়ে পরলোক-প্রস্থিতের সংসারমুখী সংস্কারকে বিনাশ করে তার

ভবিষ্যৎ অগ্রগমনকে শান্তিময় করে । শ্রাদ্ধাদির ফলও তাই । অকপট চিত্তে আজ প্রার্থনা কর এঁদের মঙ্গলের জন্য, একাগ্র মনে এঁদের মঙ্গলার্থে পরমাত্মার অভয়নাম জপ কর এবং সমগ্র জপফল এঁদের জন্য অর্পণ কর । এতে তোমাদেরও কুশল, এঁদেরও কুশল, সমগ্র জগতেরও কুশল ।”

আবার আসিবে তারা (অঃ সঃ ১১-৪-১১৬)

“মাটিতে যাহারা পচিল ভাই,
শ্মশানে যাহারা হইল ছাই,
আবার আসিবে তারা,
আমার নয়নে নয়ন মিলায়ে
ফেলিবে অশ্রুধারা ।
আবার আসিবে তারা ।
দূরে অতি দূরে গেল চলে,
কিছু বলে, কিছু নাহি বলে,
সবাই আবার ফিরিয়া আসিবে,
প্রেমে হয়ে মাতোয়ারা,
মোহন মিলন-মুরলী বাজিয়ে
মুক্ত, বাঁধন-হারা,
আবার আসিবে তারা ।
গেছে চলে, তবু কাঁদি না ভাই,
গেছে চলে, তবু যাওয়া যে নাই;
গেছে চলে ফিরে আসিবে বলিয়া,
অন্তরে জাগে সাড়া;
সবারে হারায়ে বুঝেছি চরম,

কেহ নহে মোরে ছাড়া ।
আবার আসিবে তারা ।
আবার আসিবে হাসিতে হাসিতে,
সোহাগ-সলিলে ভাসিতে ভাসিতে,
মিলন-মালায় গাঁথি বনফুল,
গাঁথি আকাশের তারা;
আবার আসিবে তারা ।"

তবু দুঃখ নাই (অঃ সঃ ১১শ খণ্ড ৪র্থ সং পৃ ১১৮)

"এই ভারতের সহস্র সহস্র সাধকেরা বলেছেন, - 'আর যেন ফিরে না আসি এই দুখের দেশে ।' জন্ম দুঃখময়, মৃত্যু দুঃখময়, জীবন-যাত্রা দুঃখময় । তাই এই দেশ থেকে একবার পাড়ি দিয়ে সে দেশে পৌছুতে পারলে আর ফিরে আসবার ইচ্ছাটি কেউ করেন না । কিন্তু বাছা, যুগে যুগে মানবমনের অনুভূতি-ভঙ্গীর পরিবর্তন হয় । আমার মনোভঙ্গী হচ্ছে এই ।

এসেছি এই দুখের দেশে,
সবই দুঃখ হেসে হেসে,
তবু আমার প্রাণ-প্রভুরে
দেখতে পাওয়া চাই,
আস্‌ব যাব বারংবার,
হয় যদি তাই ইচ্ছা তাঁর;
তাঁরে যদি আমার প্রাণের,
মধ্যখানে পাই ।
জন্ম মৃত্যু দুঃখময়,
তবু দুঃখ নাই ।।

যাঁর নয়নের ইঙ্গিতে
যাঁর মননের ভঙ্গীতে
সঙ্গীতেরই মতন হয়ে
ফুটল চারি ঠাঁই
বিশ্ব ভাষায় বিশ্ব মধু, -
আনন্দে কুড়াই ।
তাঁর চরণে নয়ন রেখে
এই আসি এই যাই ।
জন্ম মৃত্যু দুঃখময়,-
তবু দুঃখ নাই ।।
আস্‌ব যত, যাবও তত,
তন্তুবায়ের মাকুর মত;
আমার যাওয়া-আসার মাঝে
তাঁহার মহিমাই
জ্বলজ্বলন্ত দীপক রাগে
দিনরজনী গাই ।
যাওয়া-আসায় নিত্য আমি
তাঁর পানেই ধাই ।
জন্ম মৃত্যু দুঃখময়, -
তবু দুঃখ নাই ।।"

আমরণ সাধন (অঃ সঃ ১৩শ খণ্ড ৩য় সং পৃঃ ২৯২)

"শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ অতীব সহজ বলিয়া অনুমিত হইলেও ইহা নিতান্ত সহজ কার্য নহে । জগতে অনেক সময়ে সহজ কার্যগুলিই সবচেয়ে কঠিন হইয়া থাকে । মনের একান্ত

অনুগত ভাব ব্যতীত শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ কখনও সহজ কার্য হয় না । জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শ্বাস-প্রাশ্বাস চলিতেছে বলিয়া শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপকে 'সহজ-সাধন' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে । কিন্তু মরণ-কাল পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস চলিবে বলিয়া এই সাধনকে 'আমরণ-সাধন' আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত । জন্মকালে যে শ্বাস প্রশ্বাস টানিয়াছ, তখন কি জানিয়াছ যে, সঙ্গে সঙ্গে নামজপ চালাইতে হইবে ? আজ জানিয়াছ এবং মরণকাল পর্যন্ত চেষ্টা করিলে শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ চালাইতে সমর্থ হইবে । সুতরাং ইহাকে 'আমরণ সাধন' বলাই শ্রেয়ঃ । সাময়িক অসুখ-বিসুখে শরীর দুর্বল, অবসন্ন বা শ্বাসকষ্ট হইলে অবশ্য শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ আপাততঃ পরিহার করিবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখ যেন মৃত্যুকালে শেষ নিঃশ্বাসটী ভগবানের পরম পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ফেলিতে পার ।

জীবন ভরিয়া কে কি করিলাম আর না করিলাম, তাহা যদিও একান্ত উপেক্ষার কথা নহে, কিন্তু তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মরণকালে কে কি করিয়া চলিয়া গেলাম, ইহাই জীবনের সবচেয়ে বড় কথা । মরণকালে কি বিষয়-বাসনায় জর্জরিত চিত্ত লইয়া ভগবানকে ভুলিয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে, বা বিষয় ভুলিয়া একমাত্র পরমেশ্বরের দিব্য স্মৃতিকেই চিত্তে উদ্দীপিত রাখিয়া হরি-ওঁ স্মরিতে স্মরিতে জয়যাত্রা করিবে ? মানুষের জীবনে ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুশ্চিন্তার বিষয় আমি আর কিছুই খুঁজিয়া পাই না । কিন্তু জীবন ভরিয়া যে শ্বাস-প্রশ্বাসে নামের সেবা করিতে চেষ্টা করে নাই, মরণকালে হঠাৎ কি করিয়া তাহার শেষ নিঃশ্বাস ভগবানের নাম করিয়া বসিবে ? অবশ্য, অঘটন জগতে অজস্র ঘটিতেছে, কিন্তু অঘটনের আশায় হাত-পা ছাড়িয়া না দিয়া স্বাভাবিক নিয়মে যাহা ঘটিতে পারে, তাহার জন্যই নিজেকে সর্বক্ষণ প্রস্তুত করিতে থাকা সর্বোত্তম কার্য ।

মরণকালের মহাকার্য উদ্‌যাপনে যাহাতে না অসমর্থ হও, তাহারই জন্য জীবৎকালে অবিশ্রাম নামের অনুশীলন চালাও ।"

জীবন অনিত্য (অঃ সঃ ১৪শ খণ্ড ২য় সং পৃঃ ১১২)

১। "জীবন অনিত্য । একদিন তুমিও এই জগৎ হইতে বিদায় লইবে । আজ যাঁহারা বিদায় নিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শোকাচ্ছন্ন হইবার কোনও তাৎপর্য নাই, যদি সঙ্গে সঙ্গে না ভাবিতে পার যে, একদা তুমিও যাইবে । শুধু যাইবে বলিব কেন, তোমাকেও যাইতেই হইবে, শত ইচ্ছা বা শত চেষ্টা করিয়াও সেদিন এদেশে থাকিতে পারিবে না । কাঁদিয়া আকুল হইলেও যাইতেই হইবে । এ বিধানের আর কোনও পরিবর্তন সাধন কোনও প্রকারেই সম্ভব হইবে না । সুতরাং জীবন থাকিতে থাকিতে সৎকাজ কি এবং কতটুকু করিয়া লইতে পার, তাহা দেখ । ———

তবে সকলের সেরা সৎকার্য হইতেছে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে অবিরাম ভগবানের নাম করা । ইহাতে অর্থেরও প্রয়োজন নাই, গায়ে পায়ে প্রচণ্ড সামর্থ্যেরও প্রয়োজন নাই । এই সৎকার্যের অনুষ্ঠান-দ্বারা দেহমন বিশ্বমঙ্গল সাধনের উপযোগী হয় । এই সৎকার্যের অনুষ্ঠানদ্বারা অন্তরে নিষ্কাম, নিষ্কলুষ, প্রতিদানলোভহীন, পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশাবর্জিত নির্মল জীবসেবার সামর্থ্য সঞ্জাত ও সঞ্চিত হয় । এই সৎকার্যদ্বারা জগতের প্রত্যেকটী প্রাণীর সহিত নিজের সত্য সম্বন্ধ নির্ণীত ও স্থাপিত হয় । এই একটী সৎকার্যের মহিমায় একমাত্র বিশ্বপ্রাণের আকর্ষণে সকল পর আপন হয়, সকল দূর নিকট হয়, সকল শত্রু মিত্র হয়, সকল অনিত্য বস্তু নিত্য হয় । সুতরাং জীবনকে নিতান্তই খেলো জিনিষ জানিয়া এই ক্ষণভঙ্গুর জৈবিক সুখস্বপ্নে না মজিয়া,

স্বল্পকালস্থায়ী এই আয়ুকে বিশ্বাস না করিয়া অচিরে নাম রূপ পরমসত্যে আত্মনিমজ্জনের জন্য প্রস্তুত হও। শান্তি ইহাতে, সুখ ইহাতে, তৃপ্তি ইহাতে, আনন্দ ইহাতে, নিত্যকালের নিশ্চিন্ততা ইহাতে।"

২। (অঃ সঃ ১৪শ খণ্ড ২য় সং পৃঃ ১২০) "জীবন অনিত্য, মৃত্যুই ধ্রুব। প্রতিদিন কত লোকের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিতেছ, কিন্তু একবারও ভাব না যে, তোমার নিজেরও মৃত্যু আছে। সূতিকাগৃহের অপেক্ষাও শ্মশান বেশী সত্য। কাহারও ঘরে আর শিশু জন্ম লইবে কিনা, তাহা অনিশ্চিত কিন্তু যে গৃহেই যে একদা জন্মিয়া থাকুক, একদা তাহাকে আবার মরিতেও হইবে। প্রত্যেকটী প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পরমায়ু হ্রাস পাইতেছে। বড় হইতেছে, না মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যাইতেছে। সুতরাং হাতে সময় থাকিতে থাকিতে কাজে লাগ।

এই কাজ ভগবানের কাজ। এই কাজ তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ। তাঁহাকে আপন বলিয়া জানা এবং তাঁহার চরণে নিঃশেষে নিজেকে নিবেদন করা - ইহাই হইতেছে জগতের সেরা কাজ। অন্য সকল কাজ করিও, বাদ দিবার প্রায়োজন নাই, কিন্তু আসল কাজের অনুগত রাখিয়া করিও। সংসার করিও, অর্থার্জন করিও, দীন-দুঃখীর দৈন্য-দুঃখ বিদূরণের প্রয়াসে হাত দিও, স্বদেশ স্বাধীন করিবার পবিত্র প্রযত্নে রত হইও, - সব কাজই করিতে পার, কিন্তু প্রধান কাজটীর অনুগত থাকিয়া। ভগবানকে বিত্ত দিয়া সুখী করা যায় না, প্রেম দিয়া সুখী করিতে হয়। তাঁর চরণে চুক্তিহীন, যুক্তিহীন, দাবীহীন আত্মসমর্পণই হইতেছে প্রেমের করাকাষ্ঠা।"

জীবনের শেষ দিন

(অঃ সঃ ১৫শ খণ্ড ২য় পৃঃ ৩৮)

"মৃত্যু যে-কোনো দিন হতে পারে, যে-কোনও মুহূর্তে হতে পারে। মৃত্যু তোমার ইচ্ছার অধীন নয়। তুমি তোমার ভিটার দালান গেঁথে শেষ কত্তে পারনি বলে মৃত্যু দাঁড়িয়ে থাকবে না। তুমি তোমার পাওনা গণ্ডা পূরাপূরি আদায় কত্তে পারনি বলে মৃত্যু তজ্জন্য অপেক্ষা কর্বে না। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি বলে সে তোমাকে সময় দেবে না। তোমার পুণ্যের পরিধি প্রার্থনানুযায়ী বিস্তারিত হয়নি বলে সে তোমাকে নূতন মেয়াদ দেবে না। তার সময়মত সে এসে যাবে এবং তোমার প্রাণ হরণ কর্বে। সুতরাং প্রত্যেকটা দিনকেই তোমার মৃত্যুর দিন জ্ঞান করে প্রস্তুত থাক। এমন ভাবে প্রস্তুত থাক যেন, যে কোনও সময়ে মরে গেলেও অন্তরে আফশোষ না থাকে। আরও কিছুকাল বেঁচে থাক্‌ব, জনহিত কর্ব, আত্মোৎকর্ষ কর্ব, ভগবৎ-সাধনা কর্ব, এরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকা দোষের নয়। বরং এখনি মরে যাব, বেঁচে থেকে আর লাভ কি, যে-কোনো উপায়ে দ্রুত মরতে পারলেই বাঁচি, এই জাতীয় মনোভাব থাকা দোষের। দীর্ঘায়ু প্রার্থনায় দোষ নেই, কেননা আয়ু পেলে আত্ম-সংশোধন, আত্মোৎকর্ষ সাধন এবং ভগবৎ-প্রীতি সম্পাদনের জন্য অবসর ও সুযোগ পাওয়া যাবে। সুতরাং দীর্ঘায়ু প্রার্থনায় বরং গুণ আছে। কিন্তু তবু জেনে রাখতে হবে, জীবন নশ্বর, অচিরস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর এবং একান্তই অনিশ্চিত। এমন জীবন যাপন কর, যেন আজই যদি মরে যাও, তবু তোমার জীবনকে অপূর্ণ বলে মনে করার কারণ না থাকে। এমন জীবন-যাপন কর যেন প্রত্যেকটা দিনই যে তোমার শেষ দিন, এই কথাটা ভাবতে অনুতাপ, বেদনা, শঙ্কা বা অস্বস্তি না

আসে, যে-কোনও মুহূর্তে অক্লেশে মৃত্যুকে বরণ কত্তে যেন দ্বিধা না আসে।

কে জানে ভাই চখ্ বুজিবার

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি আবৃত্তি করিলেন,

কে জানে ভাই চখ্ বুজিবার
দিনটী আজই কিনা।
হয়ত রে আজ বিদায়-বাজন
বাজবে জীবন-বীণা।
হয়ত রে তোর সুখের মেলা
ভাঙ্গবে আজই সাঁঝের বেলা,
হবে পরমায়ুর ভেলা
সাগর-জলে লীনা।
এতকালের গানের রেশ
হয়ত আজই হবে শেষ,
কোন্ সাহসে থাক্‌বি প্রভুর
চরণ-তরী বিনা,
দুঃসাহসী লতার মত
আশ্রয়-বিহীনা ?

মৃত্যুও নিশ্চিন্ত নির্ভর

শ্রীশ্রী বাবামণি বলিলেন, – প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে কিন্তু লতা বৃক্ষকে আশ্রয় করেনি। তার অবস্থা কেমন চিন্তা করে দেখ। মানুষ তুমি নগণ্য হতে পার কিন্তু ভগবানকে আশ্রয় কর্লে জীবন এবং মৃত্যু উভয়ের প্রভাব তোমার উপর থেকে চলে যায়,

তখন তুমি মুক্ত, তখন তুমি শাশ্বত, সনাতন, অব্যয়, অবিচল, নিরঞ্জন, অক্ষয়, অপরিবর্তনীয় এবং আনন্দময় পরমসত্তা। হঠাৎ একদিন জীবন পেয়েছে, হঠাৎ একদিন জীবন হারাতে পার, কিন্তু প্রেমময় পরম প্রভুকে সমগ্র হৃদয়, মন, চিত্ত ও আত্মা দিয়ে আলিঙ্গন করে ধর্‌লে মৃত্যু এসেও তোমার কি কত্তে পারে ? নিয়মের অধীনে মৃত্যু আসে, কিন্তু মার্কণ্ডেয় মুনির মত যিনি বিশ্বেশ্বরের আশ্রয় নিয়েছেন, মৃত্যু তার দেহকে হরণ কত্তে পারে, কিন্তু পরমপ্রভুর আশ্রিত এই নিশ্চিন্ত নির্ভর কি করে কেড়ে নেবে ?

মৃত্যুজয়ের মানে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, – পরমেশ্বরে নিশ্চিন্ত নির্ভরকেই জানবে মৃত্যু-জয়। অনন্ত পরমায়ু লাভের নাম মৃত্যুজয় নয়। অনন্ত পরমায়ু কারো কাম্যও হতে পারে না। কেননা, অনন্ত পরমায়ু হয়ত তুমি পেতে পার, কিন্তু অনন্ত যৌবন ত' পাবে না। এই জড় দেহ নির্দিষ্ট কালের পরে যৌবন-রিক্ত হবেই হবে। সুতরাং সেই দেহের অবসানকে অনন্ত কালের জন্য রোধ করে রাখার ত' কোনো সার্থকতাই হয় না। দেহকে প্রয়োজন বিদেহী ভগবানকে আপন বলে চেনার, আপন বলে জানার সাধনার জন্য। দেহকে প্রয়োজন ভগবদ্‌ভক্তির অনুশীলনের সাহায্যের জন্য। ভক্তিলাভও হল, দেহের প্রয়োজনও চুকে গেল। ভক্তির প্রবহমান অবস্থার নাম অনুরাগ, ভক্তির ক্ষীর-সম-ঘন স্রোতোহীন স্থির অবস্থার নাম নির্ভর।' অনুরাগ ও নির্ভর ভক্তিরই তরুণ এবং প্রবীণ প্রকারভেদ মাত্র এবং পরিপূর্ণ নির্ভরই হচ্ছে প্রকৃত মৃত্যুজয়।

মৃত্যুতে ভয় কেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - মৃত্যুকে সবাই ভয় পাই কেন ? যেহেতু মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা অজ্ঞাত । কিন্তু মৃত্যু যে আমারই পরমপ্রাণারাম হৃদয়-দয়িতের কোলে বসার নাম, একথা জান্‌লে মৃত্যুভয় থাকে না । মৃত্যু যে তাঁকেই প্রাণ ভরে আলিঙ্গন করার নাম, একথা জানলে মৃত্যুভয় থাকে না । মৃত্যু হওয়া আর তাঁকে পাওয়া যে এক কথা, একথা জান্‌লে মৃত্যুভয় থাকে না । আলোর অভাবে জানা পথেও চল্‌তে গা ছম্‌ছম্‌ করে । অজানা পথেও আলো থাক্‌লে চল্‌তে ভয় আদৌ থাকে না । মৃত্যুকে ভয় করি আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ । ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি যেমন এক একটা অবস্থা, মৃত্যুও তেমন একটা অবস্থা মাত্র । একে ভয় পাওয়ার কিছুনেই । তবু আমরা ভয় পাই । কেন ভয় পাই ? না, ভগবানকে আমরা ভালবাসি না । বাইরের আলোক জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে জ্বল্‌ছে বলে তাঁকে আমরা কম দেখ্‌তে পাই । মৃত্যুতে বাইরের আলোক নিবে যায়, ভিতরের আলোক জ্বলে ওঠে, তখন তাঁকে স্পষ্ট করে দেখা যায়, তাঁর বাণী স্পষ্ট করে শোনা যায়, তাঁর স্পর্শ স্পষ্ট করে পাওয়া যায়, তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্পষ্ট করে উপলব্ধি কত্তে পারি, তিনি আমার কে, আমি তাঁর কে, একথা অভ্রান্ত-ভাবে অবগত হওয়া যায় । সুতরাং মৃত্যুতে তো ভয়ের কিছু নেই ।

প্রেমিকের চক্ষে জীবন ও মৃত্যু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,- জীবন অথবা মৃত্যু, এর কোনোটীর উপরেই নিজের দাবী স্থাপন কত্তে যেও না । জীবন যে কয়দিন আছে থাকুক, এস তার সদ্ব্যবহার করি । মৃত্যু যে দিন

আসার আসুক, এস তার জন্য প্রস্তুত হই । মৃত্যু যে আমার বাসর-শয্যা । আমার প্রাণের প্রিয়ের সাথে সেদিন যে আমি পুষ্পশয্যায় শয়ন কর্ব । সেদিন যে আমার সাথে তাঁর কুণ্ঠাহীন প্রেমের চূড়ান্ত আদান প্রদান হবে । আবার জীবন যে আমার বিবাহের আয়োজন । যাঁর গলে বরমাল্য দিব, তাঁকে সাজাবার ফুলদল যে জীবৎ-কালেই আহরণ কত্তে হবে, তাঁর গলায় পরাবার মালাটী যে জীবৎ-কালেই আমাকে গেঁথে ফেল্‌তে হবে । বিবাহের লগ্ন এলে তখন কি আর মালাগাঁথার সময় থাক্‌বে ? একাজ যে আগেই সেরে রাখ্‌তে হয় । প্রেমিকের চখে জীবন এবং মৃত্যুর রূপ হচ্ছে এই । তোমরা প্রেমিক হও । দেখ্‌বে জীবন হবে পরম আস্বাদনের, মরণ হবে পরম পরিতৃপ্তির ।"

মৃত্যুর পর (অঃ সঃ ১৫শ খণ্ড ২য় সং পৃঃ ৭২)

"একজন প্রশ্ন করিলেন, - মৃত্যুর পরে মানুষের কি অবস্থা হয় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - মৃত্যুর মানে দেহের পতন । আত্মার ত' মৃত্যু নেই । আত্মা অজর অমর । দেহ-পতনের পরে নিজ নিজ কর্ম-সংস্কারগুলিকে নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আত্মা বিব্রত হয়ে পড়েন । যাঁর সংস্কারসমূহ শুভ, যিনি দেহাবস্থানকালীন নিজেকে আর দেহকে এক বলে ভ্রম করেন নি, যিনি দেহকে বিহিত কর্তব্যে নিয়োজিত করে দিয়ে আত্মাকে সব-কিছুতে অনাসক্ত দেখেছেন, তিনি মৃত্যুর পরেও নির্বিকার শান্তি আস্বাদন করেন । আর যিনি দেহকেই আত্মা ভেবে দেহের পরিতৃপ্তির জন্য লালসায় অন্ধ হয়ে নানা কল্পিত সুখের পশ্চাদ্‌ধাবন করে

বেড়িয়েছেন, তিনি দেহ-পতনের পরেই দেহ-বাস-সুলভ সংস্কার-সমূহকে আত্মার গায়ে আঠার মত লগ্ন দেখ্‌তে পান এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, লালসা প্রভৃতির কারণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও এই সকল সংস্কারের জ্বালায় অনক্ষণ্ জ্বলে মরেন ।

প্রশ্ন ঃ- এ থেকে পরিত্রাণের উপায় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি, - কাল সর্বদুঃখহারী । জ্বালায় জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে আপনি সব সংস্কার যথাকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

প্রশ্ন ঃ - পুনরায় জন্মগ্রহণের পূর্বেই কি তা ক্ষয় পায় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি, - ঈশ্বরেচ্ছায় কি না সম্ভব হয় ? কারো পায়, কারো পায় না । যাদের সংস্কার ক্ষয় পায় না, তাদের সংস্কারের ক্ষয় হয় এসে পরবর্তী জন্মে দুঃখ ভুগে ।

দেহ আর তুমি এক নও

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - কিন্তু মৃত্যুর পরে কি হয় না হয়, তার দুশ্চিন্তা না করে, দেহ থাক্‌তে থাক্‌তেই নিজের কাজ কামাল করে নাও । নিজেকে দেহের সঙ্গে এক ভেবেই ত' যত বিপদ আমরা করি । অবিরাম চিন্তা কর, দেহ আর তুমি এক নও । অবিরাম চিন্তা কর, দেহ ঈশ্বরের পবিত্র আদেশ-সমূহ পালনের জন্য সৃষ্ট । এই চিন্তা যতই গভীর হবে, দেহ ততই ঈশ্বর-মুখী হবে, দেহ ততই তোমার আত্মিক কুশলের বন্ধু হবে । যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ দেহকে লালসাহীন দৃষ্টিতে দেখ আর মনকে ঈশ্বরের পায়ে সঁপ । নিজেকে তাঁর পায়ে সঁপে দিলে তোমার ইহকাল আর তোমার পরকাল সব তিনিই দেখবেন ।

আত্মসমর্পণ কঠিন ও সহজ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ বড়ই কঠিন । কিন্তু আবার বড়ই সোজা । নিজের জ্ঞান, বিচার, বুদ্ধি ও অহমিকার গর্ব যতক্ষণ আছে, কঠিন ততক্ষণ । নিজেকে তৃণাদপি তৃণ জেনে, জগতের সকল আশ্রয় থেকে বিচ্যুত একান্ত অশরণ জেনে নিজের দিকে তাকাতে গেলেই আবার অতি সহজ ।

এখনি আত্মসমর্পণ কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - কিন্তু সহজ হোক আর কঠিন হোক, আত্মসমর্পণই আমাদের পরমাগতি । একদিন না একদিন তাঁর চরণে শরণাগত হতেই হবে । সুতরাং অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা না করে আজই এই মুহূর্তেই আত্মসমর্পণ কর । দেরী করে যখন কোনো লাভ নেই, তখন একটী পলকও প্রতীক্ষা করো না ।"

দেহাবসান ও আমিত্ব

(অঃ সঃ ১৫শ খণ্ড পৃঃ ১৮০)

"এক জনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, দেহের ধ্বংসের পরে আমাদের কি হবে, এই ত' প্রশ্ন ? দেহাবসানের পরে আমরা আমাদের প্রাণের দয়িত পরমপ্রভুর সঙ্গে মিশে যাব, তাঁর সঙ্গে আমাদের যে চির-বিচ্ছেদ, তার জ্বালা দূর হবে । কিন্তু আমিত্বের সংস্কার যতক্ষণ না লয় পায়, ততক্ষণ তাঁর সাথে পূর্ণ মিলনের প্রকৃত রসাস্বাদন করা যায় না । বারংবার জন্ম আর মরণের মধ্য দিয়ে চল্‌তে হয় । সুতরাং এই দেহের

অবসানের পূর্বেই দেহবুদ্ধি-বর্জিত হয়ে ভগবৎ-পাদপদ্মে নিজের আমিত্বকে বলি দিতে হয়। যার আমিত্ব ও অভিমান যত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, সে ভগবানের তত সমীপবর্তী।

মৃত্যু তোমার শুন্‌বে কথা

শ্রীশ্রীবাবামণি সদ্যোরচিত একটী সঙ্গীত আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, -

মৃত্যু তোমার শুন্‌বে কথা,
ভাব্‌ছ কিরে তাই ?
তোমার কথায় চলার গরজ
তার যে মোটেই নাই।
অশ্রুজলে সিক্ত নয়ন,
বিষণ্ন মুখ, আর্ত রোদন,
এসব দেখে ভুলবে কি সে,
থামবে কি সে ভাই ?
রাজায় প্রজায় সমান আদর,
তার কেহ নাই আপন কি পর;
যার যখনি সময় হবে,
তখন তারেই চাই।
কান্না-কাটি দিলাম ছেড়ে,
এই দাঁড়ালাম শঙ্কা ঝেড়ে,
যখন খুশী আসুক মরণ,
ভয়-ভাবনা নাই,-
দয়াল প্রভুর চরণখানি
একটু যদি পাই।

মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - মৃত্যু অতীব নিষ্ঠুর, অতীব ভয়ঙ্কর। মৃত্যু কারো উপরোধ মানে না, কারো অনুরোধ রাখে না। শিশু তার মাতৃস্তন আঁক্‌ড়ে ধরে কাঁদ্‌ছে, বৃদ্ধ তার ধ্বংসাবশিষ্ট বংশের শেষ দুলালের গলা জড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন কচ্ছে, ফুলের মত সুন্দর যুবক তার প্রিয়তমার ক্রোড়ে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে, কারাগার হতে পলায়িত আতঙ্কগ্রস্ত বন্দী কণ্টকবনের মধ্য দিয়ে শত আঁচড়ে ছিন্নচর্ম হয়ে ছুটে যাচ্ছে একবার শেষবারের মত তার চিরদুঃখিনী মায়ের কাণে 'মা' কথাটী উচ্চারণ করার জন্য - কিন্তু মৃত্যু কারো জন্য দয়া রাখে না, মায়া রাখে না, কারো প্রতীক্ষা করে না। সে বড়ই নিষ্ঠুর, বড়ই কঠোর। কাল তুমি মলয়ানিল-আন্দোলিত চন্দন-তরুর শাখা-প্রান্তে প্রাণের বিহগীকে নিয়ে এসে নূতনমাত্র বাসা বেঁধেছ, আজই হয়ত এই কোকিলার কুহরণ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে। আজ তোমার বসন্ত-উদ্যানে গোলাপ-কলিকা ফুটি ফুটি করে আর ফুট্‌ল না, হয়ত এখনি তার সকল পাপড়ি ঝরে পড়্‌বে। এমন অকবি, অরসিক মৃত্যু।

মৃত্যু-জয়ের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - কিন্তু সময় হলে সবাইকেই যখন যেতে হবে, তখন আর এ নিয়ে কেঁদে কেটে লাভ নেই। অন্তরের জাড্য দূর কর, ভয় পরিহার কর, দুর্বলতা অপসারিত কর। একমাত্র পরমপ্রভুর চরণ-কোণে অন্তরের সমগ্র নিষ্ঠা অর্পণ করে মৃত্যুভয়কে জয় কর। মৃত্যু অপর সকলকেই ভীত-ত্রস্ত

কত্তে পারে, পারে না প্রেমিককে। প্রেমিক হও। সমগ্র প্রাণ দিয়ে ভগবানকে ভালবাস। প্রেমিকের চক্ষে মৃত্যু হচ্ছে মিলন-বাধার অপসারণ। এই দেহ আর দেহের প্রতি আত্মবোধ, এরাই হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে মিলনের প্রধান বাধা। এরাই হচ্ছে জটিলা আর কুটিলা। তাই প্রেমিক ব্যক্তি মৃত্যুকে বড়ই স্নেহের নয়নে দেখেন, ভীতির দৃষ্টিতে নয়।"

মৃতদের সম্পর্কে চিন্তা

(অঃ সঃ ১৫/২/২৪৫)

"একটী আগন্তুক বলিল, - আমার দিবারাত্রি মনটা ভারী বিষণ্ণ থাকে। চারিদিকে যে সকল আত্মীয়-স্বজন মারা গিয়েছেন, কেবল তাঁদের কথাই মনে আসে। এজন্য আমি মনে আর শান্তি পাই না। এই চিন্তাজাল থেকে উদ্ধার পাওয়ার আমার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - উপায় অতি সহজ। তোমার যে সকল আত্মীয়, পরিজন বা পরিচিত ব্যক্তিরা গতাসু হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই একেবারে নির্গুণ পুরুষ বা গুণহীনা নারী ছিলেন না। কারো মনে ছিল দয়া, কারো প্রাণে ছিল মহত্ত্ব, কারো বা হৃদয়ে ছিল পরদুঃখকাতরতা। কেউ ছিলেন সাহসী, কেউ ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ, কেউ ছিলেন পরোপকারী। পৃথিবীতে আমরা যা'-দিগকে একেবারে গুণহীন বলে মনে করে থাকি, তাঁদের মধ্যেও এমন অনেক গুণ মাঝে মাঝে থাক্‌তে দেখা যায়, যা সাধারণতঃ দুর্লভ। একটু খুঁজে সেই সকল পুরুষ ও নারীর সদ্‌গুণগুলি বের করে নাও। তার পরে মনকে সেই সকল সদ্‌গুণের উপরে কেন্দ্রীকৃত কর। 'তাদের ভিতরে যে সকল

সদ্‌গুণ অল্প পরিমাণে ছিল, সেই সকল সদ্‌গুণ অধিক রূপে আমার ভিতরে প্রকাশমান হোক্, তাঁদের ভিতরে যে সকল গুণ অধিক পরিমাণে ছিল, সেই সকল গুণ আমার ভিতরে অধিকাধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হয়ে উঠুক',- এই ভাবে নিরন্তর চিন্তা কত্তে থাক। এভাবে চিন্তা কত্তে কত্তে তাঁদের সম্পর্কে তোমার মনের বিষাদময় ভাব দূর হয়ে যাবে এবং যেখানে কেবলই অন্ধকার দেখ্‌তে পাচ্ছিলে, সেখানে দূরদিগন্তে নবফুটন্ত আলোক দেখ্‌তে পাবে।

আগন্তুক। - তাঁদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ ছিলেন, যাঁরা আমার নানা অহিত সম্পাদন করেছেন বা আমার প্রতি বৈর ভাব পোষণ কত্তেন। তাঁদের সম্পর্কেও কি ঐ একই কথা ?

শ্রীশ্রীবাবামণি। - হাঁ, প্রায় ঐ একই কথা বল্‌ব, তবে একটু প্রকারান্তরে। তাঁদের সম্পর্কে এইরূপ ভাববে, 'তাঁরা আমার প্রতি যে বৈরাচরণ করেছেন বা অহিত সম্পাদনের চেষ্টা করেছেন, হয়ত তার পশ্চাতে তাঁদের কোনও নিগূঢ় সদভিসন্ধি ছিল, যা' আমার জানা ছিল না। অথবা তাঁরা তাঁদের নিজ বিচারে যে বিভ্রমে পতিত হয়েছেন, তার অবশ্যম্ভাবী এবং অনতিক্রমণীয় কোনও কারণ ছিল। সুতরাং তাঁরা আমার প্রতি অন্যায় বা অন্যায্য যে ব্যবহার বা চিন্তাই করে থাকুন, আমি সে সব নিয়ে মাথা ঘামাব না। কিন্তু আমার প্রতি তাঁদের আচরণ যাতে তাঁদের অনন্ত কল্যাণের বিঘ্নস্বরূপ হয়ে না থাকে, এজন্য আমি ভগবানের কাছে তাঁদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কর্ব।' - এভাবে ভাবতে ভাবতে মনের তিক্ততা, বিরসতা, অস্থিরতা কমে যাবে এবং দেখ্‌তে পাবে যে, আস্তে আস্তে তুমি বিমল শান্তির অধিকারী হয়েছ। মৃতের সম্পর্কে যখন চিন্তা আসবে, তখন ভাব্‌তে থাকবে যে এই পার্থিব দেহে আজ তাঁরা থাক্‌লে যে যে কামনা, যে যে বাসনা যে ভাবে চরিতার্থ কর্বার জন্য চেষ্টা কত্তে পাত্তেন, দেহ না

থাকায়; সে সামর্থ্য থেকে তাঁরা বঞ্চিত। সুতরাং তাঁরা যদি তোমার প্রতি কোনও অন্যায় বা অধর্ম করেও থাকেন, তবু তুমি তাঁদের আর দোষ ধর্বে না।"

ভগবৎ-প্রেমিকের জন্ম-মৃত্যু

(অঃ সঃ ১৬-২-৮৮)

"জন্মমরণের দুঃখে কাতর হইয়া অনেকেই আর পুনর্জন্ম চাহে না। তোমাদের পক্ষে জন্ম অথবা মৃত্যুকে ভয়ের কোনও কারণই নাই। তোমাদের জীবন ও মরণ, তোমাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব, তোমাদের আত্মপ্রকাশ ও আত্মগোপনতা সকলই জানিও এক পরম-লক্ষ্য ভগবৎ-সেবার পানে তাকাইয়া। দেহী বা বিদেহী সর্বাবস্থাতেই তোমরা ভগবানের একান্ত সেবক। ভগবদ্-ভজনেই তোমাদের রতি, ভগবৎ-সেবাই তোমাদের স্বভাব, ভগবৎ-প্রীতি-সম্পাদনই তোমাদের স্বধর্ম। এই নিত্যধর্মে যার অনুরক্তি, জন্ম বা মৃত্যু, জরা বা ব্যাধি, দুঃখ বা দৈন্য তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না, মরিয়াও সে অমর, জন্মিয়াও সে অজ, জরাগ্রস্ত হইয়াও সে অজর, ব্যাধিতে ভুগিয়াও সে নিত্য নিরাময়, দৈন্যে ডুবিয়াও সে অদৈন্য, দুঃখে বারংবার নিষ্পেষিত হইয়াও সে দুঃখহীন। এই কারণেই সে নিত্যাভয়।"

মৃত্যু ও শোক

(অঃ সঃ ১৮শ খণ্ড ২য় সং পৃঃ ২৪৩)

"মৃত্যুর হাত হইতে কোনও প্রাণীর রক্ষা নাই। একবার যে জীবন পাইয়াছে, একদা তাহাকে জীবন দিতেও হইবে। ইহার অন্যথা হইবার উপায় নাই। সুতরাং শোকার্ত হওয়া আমাদের

সাজে না। শোক করিয়া লাভও কিছু নাই। যে চলিয়া গেছে, তাহাকে প্রাণভরা প্রেম-সহকারে বিদায় দেওয়াই অত্যুত্তম। প্রার্থনা রাখিতে হইবে, তাহার বিগত দিনগুলির দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ, অশান্তি, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা যেন তাহার সহগামী না হয়। প্রার্থনা রাখিতে হইবে, অনির্দেশ্যের পথে এই অন্তিম যাত্রার কালে সে যেন আনন্দ, তৃপ্তি, সুখানুভূতি ও সন্তোষ লইয়া রওনা হইতে পারে। প্রার্থনা রাখিতে হইবে, সে যেন তাহার বর্তমান জন্মের সুখ-দুঃখের প্রভাবের অধীনতা পরিহার করিয়া অনন্ত অমৃতময় আনন্দলোকের প্রতিক্রিয়াহীন অনির্বচনীয় সুখরাশির অধিকারী হইতে পারে। কোনও কোনও ধর্মশাস্ত্রে মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করাকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এই জন্য যে, শোক করিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, হাহাকার করিয়া আমরা তাহার আত্মার কোনও হিত সাধন করিতে পারি না। তথাপি স্বভাবতই মানুষের মনে শোক জাগে। শোকের একমাত্র সার্থকতা এই যে, ইহা মানুষের মনকে বিনম্র করে, স্পর্ধাহীন করে, ঈশ্বরানুগত করে। শোক প্রদর্শন না করিলে লোকে নিষ্ঠুর বলিবে, ইহা নিতান্তই স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিরই উক্তি। যাহার সহিত জীবনের অধিকাংশ কাল কাটাইলে, যাহাকে মরমের মরমী, দরদের দরদী বলিয়া দীর্ঘকাল একেবারে নিঃশ্বাস-বায়ুর মতন আপন করিয়া জানিলে, সে দেহটী ছাড়িয়া চিরতরে চলিয়া গেল, তথাপি অন্তরে শোকানুভূতি জাগিল না, এইরূপ অবস্থা এক হইতে পারে বদ্ধ পাগলের, নতুবা জীবন্মুক্ত পরমহংসের। অপরের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং তুমি আত্মীয়বিয়োগে অধীর হইয়াছ বলিয়াই তোমাকে নিন্দা করিতে পারি না। তবে হিতবাণী এই শুনাইতে পারি যে, শোক করিয়া

বাস্তব লাভ যখন কিছুই দেখা যাইতেছে না, তখন প্রজ্ঞাবলে শোককে অপনোদিত করিয়া পরলোক-প্রস্থিতের নিত্য মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা, আরাধনা এবং অনুরূপ অন্যান্য অনুষ্ঠান করিয়া যত দ্রুত সম্ভব মনকে শোকমুক্ত করিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত। ইহা সহানুভূতি বর্জিত কোনও কঠোর-হৃদয় নিষ্ঠুরের মুখের কথা নহে, হিতকারী ও হিতকামী বান্ধবের বচন।"

মৃত্যুকে পরাজিত কর

(অঃ সঃ ২১শ খণ্ড ২য় সং পৃঃ ৩০)

"মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার উপায় জগতের একটী প্রাণীরও নাই। সুতরাং এই অবধারিত সত্যকে সানন্দে স্বীকার করিয়া নিয়াও মৃত্যুকে জয় করিবার অন্য একটী বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহা হইতেছে, অতীতের পূর্বপুরুষদের সাধনাকে নিজের জীবনে এমন ভাবে রূপবন্ত করা যেন ইহার ফলে তোমার বা আমার মৃত্যুর পরেও সেই সাধনার শুভফল তোমার পুত্রাদিক্রমে বা আমার শিষ্যাদিক্রমে জগতের মধ্যে ক্রমবিস্তারিত হইতে পারে। মৃত্যু তোমার দেহকেই মাত্র ধ্বংস করিতে পারিল, তোমার আরব্ধ সাধনার ক্রমবিকাশকে অবরুদ্ধ করিতে পারিল না, - এই খানেই মহাবিক্রান্ত মৃত্যুর আসল পরাজয়। যেখানে সে তোমার বা আমার আরব্ধ সাধনার ক্রমগতিকে তোমার বা আমার দেহাবসানের দ্বারাই থামাইয়া দিতে সমর্থ হইল, স্বীকার করিতে হইবে যে, সেখানেই মৃত্যুর রণতাণ্ডব জয়মাল্যে বিভূষিত হইয়াছে। মানুষের মত মানুষ মরিয়াও কখনো মরে না এই জন্য যে, তাহার দেহান্ত ঘটিলেও তাহার সাধনা অন্তহীন আবেগে ক্রমশঃ ভাবী কালকে জয় করিতে

করিতে দিগ্বিজয় করিয়া ছুটিতে পারে। মানব-সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে এভাবে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া নিজে আগাইয়া যাওয়ার ইতিহাস। এই জন্যই মানুষকে সকল দৃষ্টি সবল ভাবে নিক্ষেপ করিতে হইবে ভবিষ্যতের দিকে। মৃত্যুকে আমরা জয় করিব আমাদের বৈধ-প্রয়াসের দ্বারা। মৃত্যু আসিবে এবং যাইবে কিন্তু আমাদের ভাব-বিকাশকে কদাচ প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিবে না। তাহা অফুরন্ত কাল ব্যাপীয়া চলিতেই থাকিবে।"

কান্নার লাভ

(অঃসঃ ২১-২-৩০২)

"শোকতাপে জর্জরিত একটী মহিলা আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল শ্রীশ্রীবাবামণির চরণপ্রান্তে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - ওঠ মা, ওঠ। কান্না যখন পেয়েছে, তখন কাঁদো। কান্না সব সময়েই খারাপ নয়। অনেক সময়ে কান্না অন্তরের টনিকের কাজ করে। কাঁদতে কাঁদতে মন হালকা হয়ে গেলে কান্না থাম্‌লে, সে আর এক শান্তি। কান্না ভাল, কিন্তু কান্নাকাটি ভালো নয়। বর্ষা ভাল কিন্তু সারা বৎসর জুড়েই যদি বর্ষা থাকে, তবে তা' ভাল নয়। কাঁদতে শুরু কর্লাম, ত' কেবল কাঁদতেই থাক্‌লাম, সাত দিনের মধ্যেও বাদল আর থাম্‌ল না, একবারের জন্যও সূর্যের কিরণ চোখে পড়্‌ল না, এমন পচা বর্ষা ভলো নয়। কিছুক্ষণ কেঁদে একটুখানি থেমে একবার দেখে নাও যে, এই কান্নায় লাভ কিছু হল কিনা। কান্না যখন ঈশ্বর-প্রেরিত বস্তু, তখন তার ফলে জীবনের লাভ কিছু না কিছু হবেই হবে। সেই লাভটুকুকে দেখ্‌তে পাওয়া চাই। সেই লাভটুকু তুল্‌তে পারা চাই। কেবল কাঁদলুম, লাভ কিছুই পেলুম না, এমন কান্না নিরর্থক।

তিনি চিরকাল আছেন

ভদ্রমহিলার কান্না থামিল । শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - যাকে হারিয়েছ, তিনি তোমার পরম আত্মীয়-রূপে এসেছিলেন কিন্তু স্বরূপেতে তিনি স্বয়ং ভগবান । আবার তিনি যাঁর কাছে চলে গেলেন, তিনিও স্বয়ং ভগবান । আবার দেখ, তিনি যাঁর কাছ থেকে এসেছিলেন, তিনিও ভগবান । তিনি যাঁর কাছে বা যাঁদের কাছে এসেছিলেন, তিনি বা তাঁরাও ভগবান । অথচ ভগবান অনেকগুলি নেই, ভগবান শুধু একটী মাত্র জন । তিনি কেমন করে এক থেকেও বহু হলেন আবার বহু হয়েও একে মিশে গেলেন, পৃথক অস্তিত্ব তাঁর কিছু আর রইল না, এটাও এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার । একটু ভেবে দেখ । তাহলেই অত ঘন ঘন আর কান্না পাবে না । যিনি চলে গেছেন, তিনি যেমন চলে গেছেন, তেমন আবার তোমার মধ্যে রয়েও গেছেন । যাঁর বিরহে অত জ্বালা, তিনি তোমার সাথে নিত্য মিলনে শাশ্বত ভাবে যুক্ত । তিনি চলে গিয়েও তোমাতে রয়ে গিয়েছেন । তিনি ফিরে না এসেও তোমাতেই আছেন । নিজের ভিতরে যদি গভীর ভাবে ডুবতে পার, তবে তাঁর সঙ্গেই তোমাকে আর তোমার সঙ্গেই তাঁকে একত্র পেয়ে একেবারে অবাক হয়ে যাবে ।

নামাশ্রয়ী হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - তাঁরই মধুময় স্মারক মন্ত্র হচ্ছে সেই নাম, যেই নামে গুরু তোমাকে দীক্ষিত করেছেন । সর্বদা নামে মন লাগিয়ে রাখ । একটী নিমেষের জন্যও মনকে নাম থেকে বিযুক্ত হতে দিও না । এই নাম যে তাঁরই নাম, এই

শুভস্মৃতিটুকু যেন তোমার কখনো না অনুজ্জ্বল হয় । নামের অফুরন্ত মহিমায়, নামের অশেষ কৃপায় তোমার সর্বশুভ সম্পাদিত হবে । নামে নির্ভর কর, নামে বিশ্বাস কর, নামাশ্রয়ী হও ।"

মৃত্যুর আগে ও পরে

(অঃ সঃ ২৪শ খণ্ড ২য় সং পৃঃ ১৮৯)

"জনৈক সেবক প্রশ্ন করিল, - বাবামণি, মরণের পর মানুষ কোথায় যায় ? মরণের আগেই বা কোথায় থাকে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নাই । অথবা হয়ত সত্য সত্যই জানি কিন্তু মনে নাই । জন্মগ্রহণ করার সময়ে শরীর যে ক্লেশ পেয়েছে এবং মস্তিষ্ক এমন অগঠিত ছিল যে, তার অতীতের খবরগুলি জানা থাকা সত্ত্বেও মনে থাকার কথা নয় । আর, জন্মলাভের আগের বিদেহী অবস্থায় এই দেহের ইন্দ্রিয়গুলি ছিল না, যা হচ্ছে বর্তমান জন্মের পিতামাতার অশেষ দান ।

মৃতের জন্য শোক করিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - মৃতদের আত্মার কুশলের জন্য প্রার্থনা করিও, কিন্তু শোক করো না । ভাবতে দোষ কি যে, ভগবানের প্রিয়জন চিরদুঃখহারী ভগবানের ডাকে তাঁর কোলে আশ্রয় নিতে চলে গেছে । চলে গেছে সে সানন্দে এবং ভগবানের কাছে পৌঁছে সে জীবনের সকল দুঃখবেদনা ভুলেছে । নিদ্রা, বিস্মরণ এবং মৃত্যু এক হিসাবে মানুষের পরম বন্ধু । পরমশোকার্ত ব্যক্তিও নিদ্রাকালে ভাল থাকে । ঈশ্বরে বিশ্বাস এলে নিদ্রাও আসে । জীবনের লক্ষ লক্ষ ছোট-বড় দুঃখ আমাদের নিষ্পেষণ

করে মেরে ফেল্‌ত, যদি আমরা কতকগুলি দুঃখ আপনা আপনি বিস্মৃত হতে না পাত্তাম। দুঃখ, অপমান, লাঞ্ছনাকে ভুলে যাওয়া এই হিসাবে মস্ত বড় এক পরিত্রাণ। মৃত্যু তার চেয়েও বড় মুক্তি। মৃত্যু হলে কি আর এই পৃথিবীর দেনা-পাওনা, লাভ-ক্ষতি, যশোনিন্দা, প্রতিষ্ঠা-অপমান তোমাকে পাবে? ভাল ভাবে যদি মরতে পার, তবে তোমারই ত' পোয়া বারো। একদিন তুমি মরবে, আমি মরব, আমার ও তোমার সব প্রিয়জনেরা মরবেই মরবে, - কারণ তারা জন্মেছে। না জন্মালেই আর মরার প্রশ্নটাও উঠত না। মরার প্রশ্ন যখন সকলের পক্ষে এক এবং তার উত্তরটাও যখন সকলের পক্ষে অভিন্ন, তখন শোক করে লাভ কি?

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - ঈশ্বর সম্বন্ধে আর জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে এক একজন লোকের এক এক রকমের ধারণা আছে। যার যে ধারণাই থাকুক, কারো বিশ্বাস, অনুমান, যুক্তির সঙ্গে তোমার কোনও সংঘর্ষের হেতু দেখিনা। কারণ, তোমারও অতীতের জন্মমৃত্যুর খবর মনে নেই, তাদেরও নেই। কোন কোন আদিম-বংশীয় নরনারী-সমাজে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, মৃত্যুর পরেই অবিরাম অবিশ্রাম ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের সুযোগ পাওয়া যায় এবং তা' ঘটে খুব সম্ভ্রান্ত পরিবেশে। যার দৃষ্টিতে যেটা লোভনীয়, সে তার চাইতে সহস্র গুণ লোভনীয় পরিতৃপ্তির উপায় পায়। তার মন এই অনন্দেই ভরপূর যে, সে মরে গিয়ে ঠকেনি। এই সব ধারণা নিতান্তই গ্রাম্য, তবু কলহের প্রয়োজন নাই। মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণীয় বলে ভাববার একটা কায়দা যে সে বের কত্তে পেরেছে, তার জন্য বরং তাকে প্রশংসা

কর। যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে স্বর্গে যায়, এ বিশ্বাস সকল দেশের স্বদেশ-প্রেমিকদের মনে আছে। যুধ্যমান দুই পক্ষই ত' মনে করেন যে, তাঁরা সত্য, ধর্ম ও ন্যায়ের জন্য লড়ছেন আর বিরুদ্ধচারীরা মিথ্যা, অধর্ম ও অন্যায় করে আস্‌ছে। জিজ্ঞাস্য এই যে, দুই পক্ষেরই স্বর্গলাভ হবে কি? কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে দুই দলের যত লোক প্রাণ দিলেন, তাঁদের সবাইকে কি যুধিষ্ঠির নরকে দেখতে পান নি? যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেই স্বর্গ হয়, এই ধারণা কি তা হলে অমূলক?

সার্থক প্রাণদানের শিক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - এস আমরা ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাই যে, মানুষ যেন এমন ভাবে প্রাণদান কত্তে শিক্ষা কত্তে পারে, যে ভাবে প্রাণ দিলে স্বর্গ বা অন্তহীন ভগবদাশীর্বাদ প্রত্যেকের প্রাপ্য হতে পারে। নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের সেবা করার জন্য সমগ্র জীবন আমরা প্রবৃত্তির দাসত্ব করে বেড়াচ্ছি। তাই মৃত্যুকালে আত্মপ্রসাদ নিয়ে মহাপ্রস্থান কত্তে পারি না। অর্থাৎ স্বর্গসুখ আমাদের করায়ত্ত হয় না। সার্থক ভাবে প্রাণদানের শিক্ষা আমাদের পাওয়া প্রয়োজন।

পরলোক-প্রস্থিতের প্রতি কর্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - এস আমরা ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাই, যেন তিনি প্রতিটি পরলোক-প্রস্থিতকে পৃথিবীতে পুনরাগমনের পূর্বে যেন এমন কিছু করেন, যাতে তারা পুনরায়

জন্মগ্রহণ করার ফলে অধিকতর সাত্ত্বিক ও ঐশ্বর্য নিয়ে আবির্ভূত হতে পারে। জগন্মঙ্গল সাধন তাদের লক্ষ্য যেন হয় জন্ম থেকেই। জগন্মঙ্গল সাধনের জন্য তৈরী হতে থাকার আমাদের এই কর্তব্যটির সামাজিক ভাষায় নাম হচ্ছে শ্রাদ্ধ। একজনের শ্রাদ্ধ সেই একজনেরই কুশলপ্রদ নহে। ত্রিভুবনবাসী সকলের কুশল।"

মৃত্যুভয় কেমনে দূর হয়?

(অঃ সঃ ২৪/২/১৯৮)

"মৃত্যুভয়ের আসল কারণ, ঈশ্বরে অবিশ্বাস। যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা হয় নাই, তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আসা কঠিন। তারই জন্য ভয়কাতর মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে ঈশ্বরকে দর্শনের জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প করে সাধনে লেগে যাওয়া। যাঁকে প্রত্যক্ষ করিনি, তাঁকে দেখার সঙ্কল্প কত্তেও গোড়ায় একটু সরল বিশ্বাস, একটু খানি সহজ বিশ্বাস, এককণা নির্বিচার বিশ্বাসের প্রয়োজন। সেটা যেন অঙ্কশাস্ত্রের এক্স (X) দূরবর্তী দৃঢ়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছুবার জন্য একটা স্বাভাবিক স্বীকারোক্তি। তাকেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বীজমন্ত্র বলে আখ্যাত করা হয়। জন্মজাত সংস্কারের ন্যায় মানুষের সহজাত বিশ্বাস ঘনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ সেবা পাওয়ার ফলে দীর্ঘকালে, আস্তে আস্তে প্রত্যক্ষের আলোরেখারূপে রূপবন্ত হয়ে উপলব্ধির দৃষ্টিতে ধরা দেয়। তখন দুদৃঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাস আসে। তখন আর মৃত্যুভয় থাকে না।"

শ্রীশ্রী বাবামণির নির্দেশাবলী অবলম্বনে মৃত-সৎকার ও শ্রাদ্ধ বিধি।

মৃত সৎকার

১। মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণ যথারীতি মৃতদেহকে স্নান করাইয়া নববস্ত্র পরাইবেন এবং মৃতের ভ্রূমধ্যে একটি শ্বেতচন্দনের ফোঁটা দিবেন। তারপরে উত্তর শিয়রে শয়ন করাইয়া মৃতের বক্ষে একখানা প্রণব-বিগ্রহ রাখিয়া সকলে মৃতকে ঘিরিয়া অথবা পূর্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া সমবেত উপাসনা করিবেন।

২। মৃত-সৎকার-কালের সমবেত উপাসনা শ্মশান-মধ্যে বা সমাধি-স্থলেই করিতে হয়। যদি শ্মশান-মধ্যে বা সমাধি-স্থলে উপযুক্ত স্থান না থাকে বা অন্য কোন অসুবিধা থাকে, তবে মৃতের বাড়ীতেই উপাসনা করিলে চলিবে।

৩। মৃত-সৎকার-কালের সমবেত উপাসনাতে ভোগ নৈবেদ্যাদির ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে হইবে। তবে অঞ্জলিদান বর্জনীয় নহে।

৪। এই উপাসনার প্রণববিগ্রহ জলে নিরঞ্জন করার পর শ্রাদ্ধাধিকারীরা মৃতের মুখাগ্নি করিবেন।

৫। দাহকার্য বা সমাধিকার্য শেষ হইলে শ্মশান-বন্ধুরা জপসমর্পণ মন্ত্র দ্বারা শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া অগ্নিনির্বাণ করিবেন বা সমাধিসমাপন করিবেন।

৬। মৃত-সৎকারের পর মৃত-সৎকারকারীগণ এবং যাঁহারা মৃতদেহ স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্নান

করিবেন ।স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অশৌচ-মুক্তি হয় । তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে যে কোনও সমবেত উপাসনায় যোগদান করিবেন ।

৭। শ্রাদ্ধাধিকারীগণ স্নান করিয়া উত্তরীয় ধারণ করিবেন ।শ্রাদ্ধীয় উপাসনার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহারা অশৌচ ও সংযমব্রতাদি পালন এবং হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিবেন । অর্থাৎ প্রচলিত মঙ্গলকর শাস্ত্রীয় বিধানসমূহ পালন করিবেন । তবে স্বাস্থ্যহানীকর অত্যন্ত কঠোর বিধানসমূহ বর্জন করাই বাঞ্ছনীয় ।

৮। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আহারীয় সাজাইয়া কাকাদি বিহঙ্গমদিগকে উৎসর্গ করা অখণ্ডদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে ।

৯। স্নাত ও শুচি অবস্থায় শ্রাদ্ধাধিকারীগণ ও তাঁহাদের পরিবারের লোকেরা অখণ্ড-বিগ্রহের সেবা-পূজা, উপাসনা ও অঞ্জলি-দানাদি সব কাজই করিতে পারিবেন । তবে শ্রাদ্ধীয় উপাসনায় বসিবার পূর্বে শ্রাদ্ধাধিকারীগণ ভোগ-নৈবেদ্য স্পর্শ করিবেন না ।

১০। অখণ্ড বিধানে শ্রাদ্ধ একাদশ দিবসে করিতে হয় । যদি কোন স্থলে শ্রাদ্ধাধিকারীগণ আত্মীয়-পরিজনদের মনের দিকে তাকাইয়া একুশ, ত্রিশ বা অন্য কোন দিনে শ্রাদ্ধ করিতে বাধ্য হন, তবে সেস্থলে ইহা একটি ব্যতিক্রান্ত ব্যবস্থা হিসাবে মান্য হইবে ।

১১। অখণ্ড ধর্মে যেমন প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত, পিতা-মাতার শ্রাদ্ধেও তেমন পুত্র ও কন্যা সকলেরই সমান অধিকার স্বীকৃত ।

ক্ষৌরকর্ম

১। দশম দিবসে সকালে আত্মীয়-স্বজন, সামাজিকবর্গ,

শ্মশান-বন্ধুগণ ও শ্রাদ্ধাদিকারীগণ সকলেই ক্ষৌরকর্মাদি সমাপন করিবেন । পুরুষ শ্রাদ্ধাধিকারীগণ মস্তকমুণ্ডন করিবেন ।

২। ক্ষৌরকর্মের পর শ্রাদ্ধাধিকারীগণ স্নান করিয়া উত্তরীয় পরিত্যাগপূর্বক নববস্ত্র কিংবা ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবেন ।

অধিবাস

অধিবাস মানে পরের দিনের উৎসবের সঙ্কল্প গ্রহণ বা আগমনী-সূচক অনুষ্ঠান ।ইহা উৎসবাঙ্গনেই হওয়া প্রয়োজন । উৎসব স্থানটির আবহাওয়ার পরিশোধক রূপেও পূর্বদিন অধিবাস-অনুষ্ঠান বিশেষ কল্যাণকর ।অধিবাস পালনের দ্বারা উৎসবের মাধুর্য ও সৌষ্ঠব বর্ধিত হয় ।সমবেত উপাসনা বা হরিওঁ কীর্তনাদি দ্বারা অধিবাস উদ্যাপন সঙ্গত ।(প্রঃ ফাঃ ১৩৬৯ পৃঃ ১১০৭ অবলম্বনে)

১। সাধারণতঃ সমবেত উপাসনা দ্বারাই অধিবাস অনুষ্ঠিত হয় ।সন্ধ্যা ৬ বা ৭ ঘটিকায় শ্রাদ্ধীয় অধিবাসোপাসনা অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ।এই সমবেত উপাসনায় শ্রাদ্ধাধিকারীগণ পুরোভাগে প্রথম সারিতে বসিবেন ।তাঁহারা যথারীতি অঞ্জলিও দিবেন ।তবে ভোগনৈবেদ্যাদি স্পর্শ হইতে বিরত থাকিবেন ।

২। হরিওঁ মহানাম কীর্তনের দ্বারাও শ্রাদ্ধের অধিবাস অনুষ্ঠিত হইতে পারে ।এই ক্ষেত্রে সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ হরিও কীর্তন করিতে হয় ।কীর্তনান্তে শ্রীবিগ্রহে অঞ্জলিও দিতে হয় ।

৩। মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় শ্রাদ্ধের আগের দিন

উদয়াস্ত হরিওঁ মহানাম কীর্তনের দ্বারাও অধিবাস অনুষ্ঠিত হইতে পারে। কীর্তনান্তে শ্রীবিগ্রহে অঞ্জলিদান অবশ্য কর্তব্য।

অধিবাসের প্রসাদ বিতরণ হইবে কীর্তনান্তে অঞ্জলি দানের পরে। এই প্রসাদ শুষ্ক হইবে। তাহার পরে মৃতের গুণাবলী আলোচনা করিয়া কোনও অনুষ্ঠান করিলেও করিতে পারেন। ইহাতে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। শ্রাদ্ধদিবসে অনুরূপ কোন অনুষ্ঠানের সুযোগ থাকে না।

শ্রাদ্ধ

১। শ্রাদ্ধ দিবসে নগর পরিক্রমা ঊষাকীর্তন হইবে। এই নগর পরিক্রমায় শ্রাদ্ধাধিকারীগণও থাকিবেন।

২। নগর পরিক্রমার পর স্নানাদি সমাপন করিয়া উপাসক ও উপাসিকাগণ শ্রাদ্ধীয় সমবেত উপাসনায় বসিবেন। শ্রাদ্ধাধিকারীগণ পুরোভাগে উপবেশন করিবেন। সাধারণতঃ সকাল ৮ ঘটিকায় শ্রাদ্ধীয় সমবেত উপাসনা আরম্ভ করিতে হয়। তবে প্রয়োজনবোধে উপাসনার সময়ের পরিবর্তনে বাধা নাই। শ্রাদ্ধীয় উপাসনার প্রেমধ্বনি দেওয়ার আগে প্রথমে শ্রাদ্ধাধিকারীগণ এবং তার পরে উপাসক উপাসিকাগণ সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন।

শ্রাদ্ধাধিকারীদের সঙ্কল্প পাঠ

"অদ্য আমি আমার পরলোকপ্রস্থিত ....মহাশয়ের/

মহাশয়ার পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রবর্তিত অখণ্ড বিধি অনুযায়ী সুসম্পন্ন করিতে ব্রতী হইয়াছি। সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, আপনারা এই শ্রাদ্ধীয় সমবেত উপাসনায় অংশগ্রহণ করতঃ আমার পরলোক গত .... র বিদেহী আত্মার শান্তি-কামনায় সহযোগিতাদানে আমাকে কৃতার্থ করুন।"

উপাসকদের সঙ্কল্প পাঠ

"হে পরমকরুণাময় পরমেশ্বর, শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা/ ভগিনী .... মহাশয়ের/মহাশয়ার বিদেহী আত্মার পারলৌকিক শান্তি-কামনায় আমরা সমবেত উপাসনা ও তোমার পবিত্র নাম জপে নিরত হইতেছি, তুমি দয়া করিয়া তোমার নামে আমাদের গভীর অভিনিবেশ দাও এবং সমবেত উপাসনা ও প্রতিটিবার নাম জপের অশেষ সুফল এই পরলোকপ্রস্থিত আত্মাকে দান কর। বিদেহী আত্মা সকল দুঃখ শোকের অতীত হইয়া তোমাতে বিলীন হউন।"

সঙ্কল্পের প্রদত্ত নমুনার শূন্যস্থান যথাযোগ্যভাবে পূর্ণ করিয়া কিংবা প্রয়োজনবোধে পরিবর্তনাদি করিয়া পুনরায় লিখিয়া লইয়া পাঠ করিবেন। সঙ্কল্প পাঠের পর যথারীতি প্রেমধ্বনিসহ শ্রাদ্ধীয় সমবেত উপাসনা আরম্ভ হইবে।

৩। উপাসনার পরে যোগ্য পাত্রে অখণ্ড-সংহিতা দান বা অন্যান্য দান কার্য ও প্রসাদ বিতরণ কার্য সম্পন্ন হইবে।

৪। তাহার পরে হরিওঁ মহানাম কীর্তন করা কর্তব্য। সম্ভব হইলে সন্ধ্যা পর্যন্ত কীর্তন চলিবে। কীর্তন শেষ হইবার

পরে সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহে অঞ্জলি দানের দ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সমাপন হইবে ।

৫। কীর্তন চলাকালীন সময়ে কীর্তনের আসরের বাহিরে নীরবে ও শৃঙ্খলার সহিত ভগবদ্ভক্তদের এবং দরিদ্র-নারায়ণের সেবাদান কার্য পরিচালিত হইবে ।

৬। অখণ্ড বিধানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান একটা অতীব পবিত্র ও সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান । অতএব, সর্বপ্রযত্নে ইহার সাত্ত্বিকতা ও ভাবমাধুর্য বজায় রাখিতে হইবে । শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নিরামিষ ও সাত্ত্বিক আহারেরই ব্যবস্থা থাকিবে ।

৭। অখণ্ড বিধানে দীপ্তি জ্বালানো, দই-ভাঙ্গা, বৈষ্ণবসেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন । শ্রাদ্ধীয় সমবেত উপাসনাতে সবই নিষ্পন্ন হইয়া যায় ।

৮। অখণ্ড বিধানে শ্রাদ্ধের পর পুনরায় গয়াশ্রাদ্ধের কোনও প্রয়োজন হয় না ।

৯। অপমৃত্যু কিংবা আত্মহনন-জনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রেও একাদশাহে বা ত্রিদিবসান্তে যথাবিহিত শ্রাদ্ধ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে ।

১০। অধিবাসোপাসনা ও শ্রাদ্ধীয় উপাসনায় শ্রাদ্ধাধিকারীগণের অঞ্জলিতে তিল, হরীতকী, পুষ্প, বিল্বপত্র, দূর্বাদলাদি উপচার থাকা বাঞ্ছনীয় ।

ঃপুস্তকের প্রাপ্তিস্থানঃ
অখণ্ড উপাসনা মন্দির
স্বরূপানন্দ রোড়, লক্ষীসহর,
হাইলাকান্দি

মুদ্রণে -
রম্য কম্পিউটার প্রিন্টিং
সেন্ট্রেল রোড, লালা
জিলা - হাইলাকান্দি
মোবাইল - ৯৮৫৪৪৫৮০৮৪
মূল্য - ২০.০০ টাকা।